মনোনীতা

ব্রজেন্দ্রকুমার ভট্টাচার্য

মুকুন্দ পাবলিশার্স
৮৮ কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট,—কলিকাতা-৪

প্রথম সংস্করণ, মহালয়া ১৩৬৮

প্রকাশক : মুকুন্দ পাবলিশার্স
৮৮ কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট,
কলিকাতা-৪

মুদ্রাকর : দিলীপ মুখার্জি
বাণীরেখা প্রেস
২৭৫ বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট
কলিকাতা-১২

প্রচ্ছদ : পরেশ মালাকার

ব্লক : ব্লকম্যান (প্রসেস)

বাঁধাই : ভারতী বাইণ্ডার্স
১৪১ বিবেকানন্দ রোড
কলিকাতা-৬

পরিবেশক : মিত্রালয়
১২, বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট,
কলিকাতা-১২

দাম : তিন টাকা

উৎসর্গ

শ্রীমুকুন্দলাল পাকড়াশী

শ্রীচরণেষু—

লেখকের অন্যান্য গ্রন্থ

আকাশ মাটি (উপন্যাস)

সিষ্টার কেরী (অনুবাদ উপন্যাস)

দেওয়ালের দাগ (উপন্যাস—যন্ত্রস্থ)
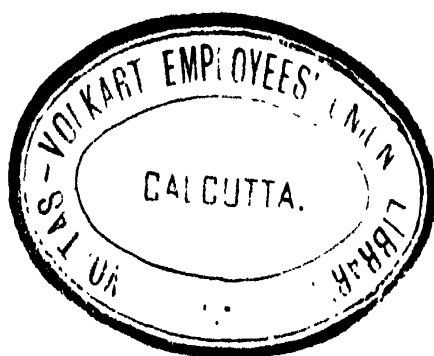
গত দশকে (১৯৫০-৬০) লেখা এই গল্পগুলি 'দেশ' 'পরিচয়' 'নতুন সাহিত্য', 'মন্দিরা', 'ইন্দ্রপ্রস্থ', ইত্যাদি বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল।

গল্পগুলি মোটামুটি রচনাকাল অনুযায়ী সংবদ্ধ হয়েছে।
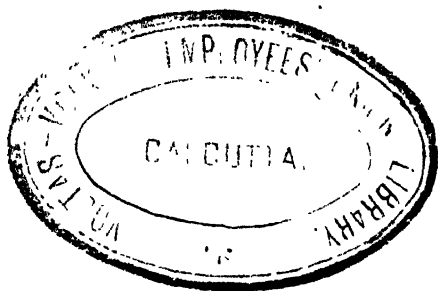
মনোনীতা

বাস থেকে নেমে শঙ্কিত চোখে মোড়ের ঘড়িটা একবার দেখে নিল সমরেশ। দশটা বাজতে বারো মিনিট।

এই পথটুকু আরো মিনিট তিনেক। দ্রুত পা চালালো সে।

দু-এক মিনিটে কী বা যায় আসে? তবু সমরেশ লাফিয়েই উঠলো সিঁড়িগুলো।

ঘড়িটার দিকে তাকিয়ে বিপিনবাবু বলেন, কী হে আসতে পারলে শেষ পর্যন্ত?

কাজ থাক বা না থাক চার্জের সাব-এডিটার আর একজন না আসা পর্যন্ত যেতে পারে না, বিশেষ করে রাত্রের শিফ্‌টে। সন্ধ্যার লোকেরা চলে গেছে। রাতের সবাই এখনো এসে পৌঁছায়নি, বিপিনবাবু ঘাঁটি আগলে বসে থাকতে থাকতে অস্থির হয়ে উঠেছেন।

অপ্রস্তুতের ভঙ্গিতে সমরেশ বলে, একটু দেরী হয়ে গেল বিপিনদা বাসের জন্যে, যান্‌ আপনি যান।

একটু আগে বের হলেই হয়, বিপিনবাবু বিরস মুখে বলেন। সেই একটায় বেরিয়েছি বাড়ি থেকে, ভালো লাগে না বাপু বুড়ো বয়সে। সত্যই, যাওয়ার সময় এক মিনিট দেরী হলেও মনে হয় ইস্‌, কতক্ষণ আটকে আছি।

সমরেশ চেয়ারে বসে আটটা থেকে চাপা দেওয়া কপিগুলো গোছাতে শুরু করে। ঘণ্টা দেড়েক আগে থেকেই বাড়ি ফেরার আবহাওয়া এসে যায়, তারপর সন্ধ্যাবেলা আড্ডা জমলে তো কথাই নেই। রাতের লোকের জন্য গুছিয়ে রাখার কথা সমরেশ ছাড়া আর কারো মনেই থাকে না।

বিপিনবাবু খান ছয়েক হাতে-লেখা কপি দিয়ে বলেন, এই নাও 'অবশ্যগুলো'। কার কোনটা লেখা আছে। দুটো কেষ্টবাবুর আছে বাংলায়, লিখিয়ে নিও ভূপেনকে দিয়ে।

ভীষণ রাগ হয় বিপিনবাবুর ওপর। কী স্বার্থপর! এগুলোও করিয়ে রাখতে পারেননি? রাতের চাপের মধ্যে এখন ট্রানস্লেসন করতে হবে। বলতে গিয়ে থেমে যায় সমরেশ। এতো নিত্য নৈমিত্তিক ব্যাপার। পারতপক্ষে কেউ 'অবশ্য' কপি ছুঁতে চান না। কোথায় কার পান থেকে চুণ খস্‌বে।

চাকরী না গেলেও ধমকানি খাওয়ার ভয় আছে। তার চেয়ে রাতের শিফ্‌টের জন্য রেখে দেওয়াই ভালো। ওদের তো দিতেই হবে মরি বাঁচি করে। কিন্তু এমনি মজা, সন্ধ্যায় থাকলেও এ কপিগুলো সমরেশের ঘাড়েই চাপে। টেবিল পরিষ্কার না থাকলে অস্বস্তি লাগে ওর।

কপিগুলো গুছিয়ে নিতে নিতে একখানা সাদা খামের চিঠি পেল সমরেশ। তারই তো, কে লিখেছে? থাক্‌গে পরে দেখা যাবে। ব্যক্তিগত চিঠি পড়ার সময় নেই এখন।

সুধাংশু আর মহীতোষ এসে নিউজ এডিটরের ঘরে একবার উঁকি মেরে আড্ডা জুড়ে দেয়। ভূপেনকে লোকাল কপি কর্‌তে হবে, গল্প করার ফুরসত নেই। কাজে বসে যায় সে।

প্রুফের তাড়া এসে গেছে। এখুনি নগেনবাবু তাগাদা দিতে আসবেন। দুটো কপিতে চোখ বুলিয়ে সুধাংশুকে দেয় সমরেশ, নিন্‌ শুরু করে দিন, ভীষণ চাপ আজ।

চাপ তোমার কোন্ দিন না থাকে বাপু। দাঁড়াও একটু জিরিয়ে নিই।

এক টিপ নস্যি নিয়ে সুধাংশু হাঁকে, নারাণ, এই হারামজাদা, জল খাওয়া। শম্ভু, চা নিয়ে আয় চার কাপ।

চা-টা বিনা পয়সায় দেয় কোম্পানী। সুতরাং চা আনানোর ভারটা সুধাংশুই নিয়েছে।

সমরেশ প্রুফের মধ্যে ডুবে যায়। পঞ্চাশ কলম কম্পোজ করা ম্যাটার আছে। রাতের কপি আছে এর ওপর। রিপোর্টারদের কপি জরুরী তা ছাড়া প্রথম পাতার খবর তো প্রায় আসেইনি এখনো।

মনে মনে হিসাব করে সমরেশ। চৌষট্টী কলমের মধ্যে বাইশ কলম বিজ্ঞাপন বাদ দিয়ে বিয়াল্লিশ কলম মাত্র। এডিটোরিয়াল, আর্টিকল, লেটারের একপাতা। তারপর রেডিও, কমার্স, স্পোর্টস, ওয়েদার —অন্তত কলম বারো। থাকলো মাত্র বাইশ কলম। হ্যাঁ ব্লক, 'অবশ্য,' লোকাল আর হেডিং-এর জন্য ছাড়ো কলম তিনেক। উনিশ, উনিশ কলম মাত্র মোট জায়গা তার। দীর্ঘনিশ্বাস পড়লো সমরেশের।

নগেনবাবু ক্ষেপেই আছেন।—নিন্ জায়গা করুন এবার। কোথায় যাবে আপনার এই ছাতামাথা গন্ধমাদন? ছাপাখানার লোক তো আর মানুষ নয়, দাও যত পারো কপি ঠেলে টিক মেরে।

সমরেশকে হাসতে হয়। প্রিন্টারকে খাতির না করলে রাতে কাগজ বের করা যায় না ঠিকমত। একটা সিগারেট এগিয়ে দেয় সে নগেনবাবুকে।

সমরেশের সিগারেটাও ধরিয়ে দেন নগেনবাবু। কথঞ্চিৎ শান্ত বোধ হয় ওঁকে। সিগারেটের ধোঁয়ার গুণে না সমরেশের খাতিরে, কে জানে?

ধোঁয়া গেলেন না নগেনবাবু। গিলে ফেলে চিবিয়ে চিবিয়ে বললেন,

দিনে থাকলে বাবুদের খেয়াল থাকে না ক-পাতা কাগজে কতটুক জায়গা। আপনি দাগান বাবু, আমি আবার দেখি ছবির ব্যাপার।
নিউজ এডিটরের ঘরের দিকে ফিরতে ভূপেনের দিকে চোখ পড়ে। বলেন, ভূপেনবাবু যে আর মাথা তুলতে পারছেন না। বলি জায়গা শুনেছেন তো? লোকাল পেজে এক কলম মেরে কেটে।
ভূপেন মাথাটা দুলিয়ে হাসির ভাব এনে বলে, দিচ্ছি কচুকাটা করে। 'অবশ্য'তেই তো দেড় কলম। 'অবশ্য' মানেই হল অবশ্য যাবে— কর্তাদের কপি। নগেনবাবু আঁতকে ওঠেন, সেরেছে, দে-ড় ক-ল-ম? এ আঁতকে ওঠাটা রোজকার ব্যাপার। ভূপেন জানে, 'অবশ্য'-র জায়গা যেমন করে হোক হবেই। আর পাঁচটা খবর বাদ দিয়েও। জরুরী? জরুরী আবার কি? এ কাগজে যা ছাপা হবে তাই খবর, তাই জরুরী সংবাদ। যা কিছু ছাপা হয় না, তা হয় মিথ্যে, না হয় ছাপা হবার যোগ্য নয়। যা ছাপা হয় তাই সত্য। ঘটনা যদি মিথ্যে হয় তবুও সেটা সত্য, অন্তত লোকে তাই মেনে নেবে। সুতরাং নিশ্চিন্তে সাবধানে 'অবশ্য' এডিট করে যাও। আর সব, জায়গা না থাকে, চোখ বুঁজে স্পাইকে গাঁথো। চাকরিটা অন্তত যাবে না। তবু বিবেকে লাগে মাঝে দু-একটা খবর ফেলে দিতে।
নগেনবাবু প্রুফ আর ছবি নিয়ে চলে যান প্রেসে।
নিউজ এডিটারের ঘরে ডাক পড়েছে। উঠে যাবার আগে সমরেশ মহীতোষকে কপিগুলো ছিঁড়ে গুছিয়ে রাখতে বলে। পি, টি, আই ও ইউ, পি, আই-এর কাগজগুলো এর মধ্যেই লম্বা হয়ে গেছে হাত পনের করে। এই তো সবে শুরু, দশটা কুড়ি।
কী হে অবস্থা কেমন? জগদীশবাবু শুধোন।
সত্তর কলম ম্যাটার আছে। জায়গা তো মোটে কলম বাইশ পাচ্ছি, 'অবশ্য'তেই তো আবার কলম দেড়েক।
আজে বাজে খবর সব ফেলে দাও, ভাসাভাসা ভাবে জগদীশবাবু বলেন।

কোন্‌টা ফেলব, কোন্‌টা রাখব, অন্তত দিনের প্রুফগুলোতেও যদি দাগ দিয়ে দিতেন। সমরেশ ভাবে।

জগদীশবাবু বলেন, ছবি আছে খান চারেক, কার্টুনটা পাঁচের পাতায় নিও। আর হ্যাঁ শোনো, কে, জি, লালের একটা স্টেটমেণ্ট আছে ; ওটা যেন দিও কোন রকম করে। মেজবাবুর বন্ধু লোক, জানো তো।

সিগারেটটা ধরিয়ে টিনটা আবার পকেট থেকে বের করে এগিয়ে দেন সমরেশের দিকে। যেন হঠাৎ মনে পড়লো সমরেশও সিগারেট খায়। সমরেশ তুলে নেয় একটা মার্কোভিচ্‌। কে, জি, লালের স্টেট্‌মেণ্টটা তাকে দিতেই হবে, সিগারেট না নিলেও।

সমরেশ টেবিলে এসে বসে আবার। কামরা বন্ধ করে জগদীশবাবু এবার নিউজ টেবিলে আসেন।

ওহে, হ্যাঁ, শোনো, ওদের মিটিং-এর খবরটা, আমি বলে দিয়েছি হেমেনকে ছোট্ট করে দু-লাইন দিতে, সাতের পাতায় একটু দিয়ে দিও। একেবারে না দিলে—চলি আমি এবার—ঈস্‌ সাড়ে দশটা বেজে গেছে!

দরজা পর্যন্ত গিয়ে ফিরে আসেন আবার জগদীশবাবু।—এই দেখো ভুলে যাচ্ছিলাম আবার। কালকের সেই জগৎজিৎ মিলের মারামারির ব্যাপারটা আজ যেন কিছু দিও না। কাল যা হয় দেখা যাবে। আর হ্যাঁ, জীবন বোসের স্টেট্‌মেণ্টটা জায়গা হলে দিয়ে দিও চার লাইন, এই দশ পয়েণ্টের বেশী যেন না হয়। এইটুকু আবার আইন বাঁচিয়ে চলা। গেলেই হল।

একটু হেসে সুধাংশুর দিকে তাকান, কী হে সুধাংশু, খুব যে কাজ করছো।

সুধাংশু ভীষণ মনোযোগ দিয়ে একটা হেডিং-ই বোধহয় ভাবছিল, একটু ওঠার পোজ করে বিনীতভাবে হাসে।

এবার সমরেশ হর্তাকর্তা বিধাতা—নাইট এডিটার। যা খুশি

ছাপতে পারে সে, যা কিছু ফেলে দিতে পারে। কালকের কাগজের সেই স্রষ্টা। তার খুশিমত চললে অবশ্য চাকরিটা টিঁকবে না পরের দিন। তার যা খুশি করার অধিকারটা গরীবের স্বাধীনতার মত। বিদ্রূপের মত খোঁচা দেয়। শ্রমিকদের যেমন বলা যেতে পারে, তোমরা স্বাধীন, ইচ্ছে হয় চাকরি করো না হয় কোরো না, কেউ বেঁধে রাখছে না তোমাদের ; তেমনি সমরেশকেও বলা হয়েছে, তুমি তোমার স্বাধীন ইচ্ছামত বুদ্ধি খাটিয়ে কাগজ বের করবে, তবে আমার ইচ্ছার সঙ্গে তোমার স্বাধীন ইচ্ছার যদি গরমিল হয়, সাবধান। চাকরি যেতে পারে, আরো অনেক কিছু হতে পারে হুঁসিয়ার।

এগারোটা বেজে গেছে। চা খেয়ে সুধাংশু মহীতোষও এবার কাজে লাগে। এগারোটা থেকে একটা, মেশিনের মত কাজ চলে। রিপোর্টারদের কপি আসতে শুরু করেছে। এদিকে ফরেন নিউজের ভিড়, নেহেরু-রাজেন্দ্রপ্রসাদের বক্তৃতা, কাশ্মীর, দুর্ভিক্ষ, দাঙ্গা, এরি মধ্যে দুটো একটা স্ট্রাইকের খবর। নিশ্বাস ফেলার সময় নেই কারো। টেলিফোনটা বেজে ওঠে ঠিক এই সময়েই। বিরক্ত হয়ে কাজ করতে করতেই বাঁ হাত তুলে সমরেশ জবাব দেয়, হ্যালো।···হ্যাঁ, আমি কথা বলছি।

ওপার থেকে কী বললো শোনা যায় না, মহীতোষ শুধু দেখলো সমরেশ চটে গেছে।

ব্যক্তিগত কথা শোনার সময় নেই আমার, তাছাড়া আপনাকে আমি চিনি না। বাসায় দেখা করবেন, জায়গা নেই, আজ কিছু ছাপতে পারবো না।

লাইনটা কেটে দিল সমরেশ বিরক্ত হয়ে। প্রুফ রীডার মন্মথ আসে, দেখুন তো এটা। কেমন যেন মিল্‌ছে না—

সমরেশ হঠাৎ ক্ষেপে যায়, না মেলে, যাতে মেলে তাই করে দিন। এটাও দেখে নিতে পারেন না আপনারা, বি-এ পাশ করে? দেখ্‌ছেন মরবার ফুরসত নেই। ·এই শম্ভু, কপি নিয়ে যা।

মন্মথ থতমত খেয়ে চলে যায়। কেউ অবশ্য কিছু মনে করে না। অস্বাভাবিক নয় এটা রাতের শিফ্‌টে। এমন যে রিপোর্টাররা, যাদের এক লাইন কাটা গেলে দিনের বেলা মাথা কাটবে, তারাও ভয়ে ভয়ে কপি দেয় সমরেশকে—দাদা, একটু দেবেন ফার্স্ট পেজে, ভাল খবর।

যতীশবাবু শেষ কপি দেন একটার পরে। সমরেশ চাপা দেয় রাগ করে।—ক-টা বেজেছে খেয়াল আছে? এদিকে তো পাতা ছাড়তে এক মিনিট দেরী হলে কৈফিয়ৎ দিতে হবে। আমার কি ছটা হাত না তিনটে মাথা? না মেশিন? কখন এডিট্ হবে, কখন কম্পোজ হবে এটা?

যতীশবাবু সিনিয়ার লোক। বলেন, চটো কেন হে, নাও নাও সিগারেট খাও। কী করি বল, আমাদের কি আর অসাধ এগারটায় বাড়ি যেতে? হয়ে ওঠে না যে।

সমরেশ বলে, কী যে করেন? এগারোটা পর্যন্ত আড্ডা।

আমাদের অবস্থাটা তো বোঝেন না। নগেনবাবু খাঁড়া উঁচিয়েই আছেন। দিয়ে দিচ্ছি, প্রুফ পড়া না হলে আমি জানি না কিন্তু।

কপিটা সুধাংশুকে দিয়ে কাজে ডুবে যায় আবার। মেশিনের চেয়ে দ্রুততর কাজ হয় যেন। লাইনো অপারেটারদের কতখানি কম্পোজ করতে হবে তার একটা সীমা আছে, নেই সাব-এডিটরদের কাজের হিসেব। জায়গা কম থাকলে আরো মুশকিল। কী ফেলবে কতটুকু দেবে, কতটা কাটবে বিচার করতে সময় লাগে। সময়ের সঙ্গে তাল রেখে দরকারী পয়েন্ট, খবরটুকুর জিস্ট বার করতে করতে হিমসিম খেয়ে যেতে হয়। তবু কাগজ ঠিকই বার হয়। 'অবশ্য'ও ছাপা হয়, দেশী বিদেশী বড় খবর, এমন কি বিবৃতি-প্রচার তাও পায় লোকে সমরেশদের কাগজে।

মাঝে মাঝে সাব-এডিটারদেরই আশ্চর্য লাগে। সব কাগজের সব সাব-এডিটারই কি একই চিন্তা করে? তাদের বিচার বুদ্ধি কি এক,

একই মেশিন থেকে বেরিয়ে আসা এক একটি নিখুঁত যন্ত্র কি তারা? সম্পাদকীয়, ছোটাখাটো খবর, বিবৃতি আর পলিসি বাদ দিয়ে খবরগুলো কেমন যেন প্রায় একই রকম হেডিং নিয়ে বেরিয়ে আসে একই ভাবে সব কাগজে।

যন্ত্রের মতই কাজ চলে, অথচ কী নিস্তব্ধ মনে হয়। টেলিপ্রিণ্টার দুটো চলেছে ঝক্‌ঝক্‌ খট্‌খট্‌ করে, তাতে নিস্তব্ধতার তপোভঙ্গ হয় না। অন্ধকার ঘরে ঘড়ির টিকটিক্‌ যেমন নৈঃশব্দেরই অঙ্গ, তেমনি এই টেলিপ্রিণ্টারের ঝক্‌ঝক্‌। সাব-এডিটারের কাজের কোন ব্যাঘাত ঘটায় না, যদিও বাইরের কেউ এলে অস্বস্তি বোধ করবে।

হঠাৎ ঘুম ভেঙে যেন ভূপেন চেঁচিয়ে ওঠে, ও সমরেশবাবু, দেখুন দেখি এটা জয়লক্ষ্মী মিলের সামনে মারামারি হয়েছে, ফায়ারিং লাঠিচার্জে চারজন সিরিয়াসলি উণ্ডেড্‌ বল্‌ছে, একজন মহিলাও আছেন।

হঁ্যা, কী বলছেন? জগৎজিৎ মিলের কোন খবর যাবে না, মালিক পক্ষের স্টেটমেণ্ট যাচ্ছে, শুনলেন না?—কাজ করতে করতে মাথা না তুলেই সমরেশ বলে।

ভূপেন বলে, না, না, জগৎজিৎ নয়, সে আমি জানি। জয়লক্ষ্মী মিল। দেখুন একবার। সমরেশ তাড়াতাড়ি কপিটায় চোখ বুলিয়ে নেয়। রেজিষ্টার্ড ইউনিয়নের প্যাডে সই করা কাগজ, কিন্তু জায়গা কোথা? তাছাড়া ইউ-পি-আই পি-টি-আই দিল না কেন? কে জানে? দরকার কি গোলমালের মধ্যে গিয়ে?

ভূপেন বলে, মানা যখন নেই, দিন না দিয়ে—

সমরেশ বলে, একে জায়গা নেই তারপর গোলমেলে ব্যাপার, থাকগে আজ।

তা দেবেন কেন? কোথাকার 'অবশ্য,' কার বক্তৃতা, কার শ্রাদ্ধ—

সমরেশ হাসে। ভূপেন এখনো রাজনীতি করে কিছু কিছু।—দাও না দিয়ে দাও তোমার লোকাল পেজে। আমাকে শুধোচ্ছ কেন?

হঁ্যা, জায়গা কত?

কেন, 'অবশ্য' একটা তুলে দাও না হে, মহীতোষ বলে ভূপেনকে ক্ষেপাবার জন্য।

সমরেশ দেখে আড্ডার আবহাওয়া আসছে তাড়া দিল মহীতোষকে, কই, হল কাশ্মীরটা?—এই যে হেডিংটা দিচ্ছি।

আবার কাজের মধ্যে ডুবে যায় সবাই। টেলিগ্রাম আসে একসঙ্গে চারটে। সমরেশ তাড়াতাড়ি দেখে নিয়ে একটা সুধাংশুকে দেয়।

ডবল কলম না সিঙ্গল?

জায়গা কোথায়? সিঙ্গল কলম দাও, হেডিংটা একটু বড় করে দিও।

ঈস্, সবগুলোই নিতে পারলে হত।

সমরেশ এবার প্রেসে যায়। লোহার ফ্রেমের মধ্যে কুরুক্ষেত্র শুরু হয়ে গেছে। দুজন মেকআপম্যান্ গলদঘর্ম হয়ে উঠেছে। কারেকশনম্যান্ চারজন ঝুঁকে পড়েছে একসঙ্গে। ওরি মধ্যে গ্যালি এসে বসছে। জায়গা মেপে সমরেশ হতাশ হয়ে পড়ছে।

নগেনবাবু গজ গজ করতে করতে তাল রাখার চেষ্টা করছেন, এটা ওর নীচে চলে না যায়, জরুরী খবর পড়ে না থাকে।

কাটুন দেখি এটা ইঞ্চি ছয়েক। হঠাৎ থেকে থেকে অভ্যাস বশে হাঁক দিয়ে ওঠেন, ওরে ঘড়ির কাঁটা যে ঘুরে গেল। ভাগ্ ভাগ্ ছয়ের পাতা ছাড়, এই শকুনগুলো। কারেক্‌টাররা ক্ষিপ্রহাতে শ্যেনদৃষ্টিতে ভুল শোধরায়। পাতা আঁটতে আঁটতে মেজ প্রিণ্টার মাধব ডাক দেয়—নকুল, ছয়ের পাতা নিয়ে যা।

এদিকে টেলিপ্রিণ্টারে চোখ বুলিয়ে মহীতোষ আঁতকে ওঠে, সেরেছে রে, ডবল কলমটা ভাঙতে হবে।

কপিটা ছিঁড়ে নিয়ে দৌড়ে প্রেসে যায় মহীতোষ—ও সমরেশ, কাশ্মীরের ডবল কলমটা ভাঙতে হবে যে।

খুন করে ফেলবে তাহলে নগেনবাবু, দেখি।

সমরেশ ঘড়ির দিকে তাকায়—দুটো পঁয়ত্রিশ। মুহূর্তের মধ্যে সিদ্ধান্ত নিতে হবে। যুদ্ধক্ষেত্রে যেন শত্রুর মুখোমুখি ওরা।

পেছোবে না এগিয়ে গিয়ে আক্রমণ করবে? নাঃ সময় নেই। মেকআপ ভাঙতে গিয়ে দেরী হয়ে যাবে, শেষ পর্যন্ত হয় খবরটা যাবে না, নয় পাতা লেট হয়ে যাবে।
ওহে এটা লেট নিউজ করে দাও। সমরেশ কপিটা ফেরত দেয় মহীতোষের হাতে।
স্টিরিও আর ম্যাঙ্গল মেসিনের শব্দ উঠেছে, নীচে প্লেট কাটার তীক্ষ্ণ কর্কশ আওয়াজ শোনা যায়, রোটারি ঘরেও কাজ শুরু হল। তীব্র চোখ-ঝলসানো আলোটা জ্বলে উঠেছে।

আরো আধ ঘণ্টা পরে কাজ শেষ হল সমরেশের। ভূপেন আর মহীতোষের কাছে বাড়ি, ওরা চলে গেছে। সুধাংশু যথারীতি ডিক্‌সনারী মাথায় দিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে। টেলিপ্রিণ্টার দুটো আর একবার দেখে চেয়ার জোড়া দিয়ে শুয়ে পড়ে সমরেশ। আঃ কী আরাম! কিন্তু এখুনি ঘুমুতে পারবে না সমরেশ, কাগজ ছাপা হয়ে বেরিয়ে না আসা পর্যন্ত স্বস্তি নেই। হঠাৎ যদি কোন বড় খবর এসে পড়ে, দিতে হবে যেমন করেই হোক্। বড় খবরে মার খেলে কথা শুনতে হবে। কাগজ ছাপা হয়ে যাবে সোয়া-চারটার মধ্যে, ট্রাম চলাও শুরু হবে। কাগজ নিয়েই তাই প্রথম ট্রামে মেসে ফেরে সমরেশ।
একবার চোখ বুলিয়ে দেখে নেয়। মেক্‌আপটা মনোমত হয়নি। কী করেই বা হবে? দু-দিকে আধকলমের ওপর বিজ্ঞাপন থাকলে সে আর কী করতে পারে।

মেসে এসে শুতে শুতে পাঁচটা। তবু ঘুম আসে না। এত উত্তেজনা পর পায়ের নখ থেকে মাথার চুল অবধি উদ্ধত হয়ে থাকে। মীরার কথা মনে পড়ে এবার।

কবে যে পাশের খবরটা পাওয়া যাবে ওর ? কবে ওরা ঘর বাঁধবে ! এই মাইনেয় দুজনের চলা অসম্ভব ঘর ভাড়া করে। তাই সে থাকে মেসে, মীরাকে থাকতে হয় যাদবপুরে দাদার কাছে। মীরা পাশ করতে পারলে একটা মাস্টারি অবশ্যই জুটবে। তারপর ? তারপর পাঁচ বছরের প্রত্যাশার পরিসমাপ্তি। একখানা ছোট্ট ফ্ল্যাট বা অন্তত একখানা ঘর। মীরা আর সমরেশ।

মীরা কাজ শুরু করেছে আবার। সমরেশ কতদূরে চলে এসেছে। নাইট ডিউটির পর টিউশনি করে, অনুবাদ করে দেওয়া ছাড়া আর কীই বা করতে পারে সে ? এছাড়া উপায়ই বা কী ? মা-বাবা বিধবা বোন, আর ভাইদের তো খাইয়ে বাঁচাতে হবে। মীরা ভালো কাজই করছে।···ইস্ আট দিন হয়ে গেল দেখা হয়নি, আসে না কেন মীরা ? এ পাড়ায় কি আসতে নেই পরীক্ষা হয়ে গেছে বলে ? অভিমান করতে গিয়েও পারে না সমরেশ।

হয়তো চিরন্তন আর্থিক সমস্যাটাই মীরার না আসার কারণ। কাল একবার দেখা করতেই হবে—ছুটি আছে······ ।

ঘুম ভাঙে নয়টায় অবনীর ডাকে। রাঙাজবার মত চোখ দুটো রগড়ে উঠে বসে সমরেশ। বলে, কী ব্যাপার রে, সকাল বেলা ? বোস্, চা আনতে বলি।

অবনী বলে, চা পরে খাওয়া যাবে, মুখটা ধুয়ে আয় তুই। বেরোতে হবে।

অবনীর মুখের দিকে তাকিয়ে আতঙ্কিত সমরেশ বলে,—কীরে, ব্যাপার কী বলতো ?

কেন, তুই জানিস্ না কিছু ? আপিসে খবর পাস্‌নি ?

না, কি হয়েছে ?

মীরা কাল গুলি খেয়েছে, অবনী আস্তে আস্তে বলে।

এঁ্যা ?—হেঁচকা টানে পাঞ্জাবীটা টেনে নেয় সমরেশ।

আর, কাগজপত্রগুলো ছড়িয়ে পড়ে বুক পকেট থেকে। তার মধ্যে

সেই কাল রাতের চিঠিখানা। ভুলেই গিয়েছিল সে। বিরক্ত মুখে তবু ছিঁড়ে ফেললো সমরেশ চিঠিটা পড়তে পড়তে।

কে একজন সুনীলবাবু লিখেছেন মীরার নাম করে, কায়ারিং-এর খবরটা পাঠানো হল, যেন ছাপা হয়।

হঠাৎ সমরেশের মনে পড়ে, তাই তো। মীরা বসু বলে একটি মেয়ের যেন নাম ছিল জয়লক্ষ্মী মিলের খবরটায়!

হীরা-মাণিক

খুড়পী দিয়ে বেগুনগাছের গোড়া খুঁড়িতেছিল ঘোষাল বুড়ী। অমা, ও আবার কে ইদিক পানে আসছে? এই মরেছে, ছুঁড়ি বোধ হয় দিলো নাউ গাছটা মাড়িয়ে। হাঁ হাঁ করিয়া উঠিয়া দাঁড়ায় বুড়ী—চোকের মাথা খেইচিস, বলি হ্যাঁলা ছুঁড়ি, ইদিকে নাউ-ডগাগুলো আপসে মরবে যে।

হ্যাঁ তা লাউডগাগুলো কনকনাইয়া উঠিতেছে বটে, অমলা তাকাইয়া দেখে। বলে ও পিসি, কোথা তোমার লাউডগা মাড়ালাম আমি!

: মাড়ালি না, বলি হ্যাঁলা মাড়ালি না তুই নাউডগাগুলো? আমি মিথ্যে বলছি? আমাকে মিথ্যুক বললি তুই! য়াঁ! এত বড় আস্পদ্দা হয়েছে তোর? সেদিনকার ছুঁড়ি, চ,' যাচ্ছি আমি তোর বাপের কাছে। বলে, তোর বাপকে হতে দেখলাম আমি—

: ও পিসি ঘাট হয়েছে আমার, এই কাণ মলছি বাবা, আর যদি কোনদিন তোমার বাড়ী বেড়াতে আসি আমি। অমলা কাঁদো কাঁদো হইয়া যায়। অন্যায়টা তাহার হইয়াছে বৈকি চুপি চুপি ফুল তুলিতে আসিয়া।

বুড়ী কিন্তু জল হইয়া যায় তাহার বাড়ী বেড়াইতে আসিয়াছে শুনিয়া।—অঁমা তাই বল্, আমার কাছে বেড়াতে এসিচিস্ তুই? আয় মা আয়, বোস বোস। তাইতো বলি অমু আমার সন্দেবেলা ইদিকে কোতা। আর বলিস্ না মা, এই দেখ না বুড়ো মানুষ কষ্ট করে নাউ নাগাই, কুমড়ো নাগাই, আর হারামজাদা হারামজাদীরা

এসে পট্ পট্ করে ছিঁড়ে নিয়ে যায় না। বলি, হাতে যে পোকা হবে। হ্যাঁ মা বেড়া দিয়ে নয় গরু-বাচুর ঠেকালাম, এই দুষমন-গুলোকে কী করি বল্‌তো। আর তাও বলি খাবার ইচ্ছে হয়, চেয়ে নিয়ে যা। আমার আর কে খাবে বল, শত্তুর শত্তুর সব পেটে ধরেছিলাম আমি।

বিগত দুই সন্তানের শোকে তেইশ বছর পরেও বুড়ির চোখে জল আসিয়া যায়।

এখুনি যত কাহিনী শোনাইতে বসিবে ঘোষালবুড়ী। এই জন্যই কেহ আসে না বুড়ীর বাড়ী। গল্প একবার শুরু হইলে পাকা দুটি ঘণ্টা। অমলা বলে ও পিসিমা, বেগুনগুলো তো তোমার বেশ হয়েছে। কোতাকার বীজ আনিয়েছিলে বলো তো? মা বলছিলো—

: অ-মা বামুণপাড়ার বৌ-এর বুঝি বেগুন নাগাবার সক হয়েছে। নিবি? যা না দুটো নিয়ে, মাকে দিবি গিয়ে। ভেজে দেবে এখন, দেকিস খেয়ে মাকমের মতন নাগবে।—

গাছপালার প্রশংসা করলে ভারী খুসী হয় খুড়ী। পট্ পট্ করিয়া চারটা বেগুন তুলিয়া দেয়।

বেগুন হাতে করিয়া অমলা বলে, আজ চলি পিসি সন্দে হয়ে এলো।

: অমু, যাস্‌নি মা, এই দেক ভুলে গিইছি, কি এক দুটিশ ফুটিশ দিয়ে গিয়েছে বাপু। দেক দিকি কি নিকেছে। দাঁড়া মা একটু নিয়ে আসি, মনের কি আর বশ আছে, সব ভুলে যাই মা।

বুড়ী একখানা পোষ্টকার্ড আনিয়া দেয়। অমলা দেখিয়া বলে, ও পিসি, এযে চিঠি গো।

• চিটি? চিটি কোথায়? রাজার মুড়ো নেই, চিটি আবার কেমন করে হলো?

বুড়ী রাজার মুণ্ডু খোঁজে।

: হ্যাঁগো হ্যাঁ, চিঠি। এযে পাকিস্তানের পোষ্টকার্ড, পাকিস্তানের

আবার কে আছে তোমার? কই শুনিনি তো কোন দিন। হর-সু-ন্দ-র চক্রবর্ত্তী। কে হয় তোমার পিসি?

চিঠি শোনার আগ্রহে রাজার মুণ্ডুর প্রশ্নটা চাপা পড়িয়া যায়। বুড়ীর বাঁ হাতটা কোন কালে ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল সেটাকে টিপিতে টিপিতে বলে, কই না, কেরে বাপু; মনে পড়চে না তো! তুই পড় না চিঠিটা; দেকি কে কি নিকেচে। কে আবার আমাকে চিটি নিকতে গেল।—সত্যিই তো তিনকূলে যাহার কেহ নেই তাহাকে কে চিঠি লিখিবে, আশ্চর্যের কথা বৈকি।

অমলা চিঠি পড়ে—'শ্রীচরণেষু, আপনি হয়তো ভুলিয়া গিয়াছেন আমি বাবাজীবন চিন্তাহরণের মামা। বহুদিন দেখা-সাক্ষাৎ নাই ভুলিয়া যাইবারই কথা। বড়ই বিপদে পড়িয়া আপনার আশ্রয় চাহিতেছি। চিন্তাহরণের বাড়ীতে চিঠি দিয়াছিলাম। উত্তরে জানিলাম, তাঁহারা বহুদিন দেশছাড়া। সেখান হইতেই আপনার ঠিকানা যোগাড় করিয়া এই চিঠি দিতেছি। আমি অদ্য বুধবার সপরিবারে আপনাদের ওখানে যাইতেছি। আশা করি ৪।৫ দিনের মধ্যে পৌঁছিব। সাক্ষাতে সকল বলিব। প্রণাম লইবেন। ইতি—

হরসুন্দর চক্রবর্ত্তী। সাং পীরপুর জেলা ঢাকা।

এইবার বুড়ী চিনিতে পারে।—অ-মা তাই বল্, চিন্তার মামা। তা কি করে মনে থাকবে বল, সে কতো দিনকার কথা। আহা চিন্তা আমার মরে গেল বাছারে, মায়ের শোক কি সয়, কচি ছেলে। আমি সেই আবাগী, হতভাগী, ছুই ছেলে মেয়ে খেয়ে যক হয়ে বসে আচি। যমেরও অরুচি রে আমি। আহা চিন্তা আমাকে কি ভালই বাসতো। বেশ করেছিল নিয়ে গিয়েছিলো মামারা। সৎ-মার ঘরে কি যত্নআত্তি হয়। হ্যাঁ সৎ-মা বটে আঁটকুলের সেই বৌ, ছেলে-অন্ত প্রাণ।

অমলা এবার সত্যিই বিরক্ত হয়। পাশ কাটাবার জন্য বলে, আমি চলি এবার পিসি সন্দে হয়ে গেলো যে।

বুড়ীর চমক ভাঙে, হ্যাঁ মা, কি নিকেচে বল্লি চিন্তার মামা?

: ওঁরা সব আসবেন গো, রওনা হয়েছেন বুধবারে। কাল নাগাদ পৌঁছে যাবে।

: বৌ-টৌ সব নিয়ে আসছে, নয়?

: হ্যাঁ হ্যাঁ সব নিয়ে আসছে। পাকিস্তান থেকে পালিয়ে আসছে। ওখানে যে খুনোখুনি দাঙ্গা, শোনো নেই তুমি কিছু?

: তা আসুক আসুক। আহা, তাহলে তো বড় আতান্তরে পড়েচে ওরা। বাড়ীটার আমার ছিরি ফিরুক। হ্যাঁলা মানুষ জন নইলে বাড়ী মানায়? পুলিন লক্ষ্মী বেঁচে থাকলে কী আনন্দই করতো।— বুড়ী আবার প্যানপ্যানানি সুরু করিবে এখুনি। অমলা অনুমতির অপেক্ষা না লইয়াই চলিতে সুরু করে। ঈস্ কতো দেরী হইয়া গেল বাড়ী ফিরিতে, মা-এর কাছে নির্ঘাৎ বকুনি খাইতে হইবে।

অমলার খবরের ধমকে মায়ের বকুনি বন্ধ হইয়া যায়। আধমরা গ্রামে আবার কয়টি প্রাণীর সমাগম হইবে। হউক না পাকিস্তানের পলাতক বাস্তুহারা, হউক না ছিন্নভিন্ন বিপর্যস্ত, তবু তো গ্রামের লোকসংখ্যা তিন-চার পাঁচ-ছয়টি বাড়িবে। রাতারাতি গ্রামের মানুষগুলি জানিতে পারে সংবাদটা। এমন কিছু উপকারে আসিবে না নবাগত বাঙালগুলি, তবু উৎসাহে সকলে জটলা পাকায়, কি জানি হয়তো ভদ্রলোক ডাক্তারও তো হইতে পারেন, কিংবা মরুক গিয়ে অন্তত তাস খেলা, আড্ডা দেওয়ার লোকও তো জুটিবে। সপ্তাহের সাড়ে পাঁচটি দিন যেন মরিয়া থাকে গ্রামটি। মেসে হোটেলে থাকে চাকুরে বাবু আর পড়ুয়ারা—সপ্তাহান্তে শনিবার সন্ধ্যা হইতে জমিয়া ওঠে গ্রাম, ছেলেরা কর্তারা ফিরিয়া আসেন।

সারারাত্রি বুড়ী স্বপ্ন দেখে। বাড়ীটা তেইশ বৎসর পরে আবার লোকজনে ভরিয়া উঠিবে। তেইশ বছর আগে চলিয়া গিয়াছে লক্ষ্মী, তাহারও দুই বছর আগে ফাঁকি দিয়া পালাইয়াছে পুলিন সাত বছরেরটি হইয়া। তাহার পর হইতে বাড়ী শ্মশান হইয়া আছে। লোকে

ভুলিয়া গিয়াছে পুলিন লক্ষ্মীকে। তাঁহার কিন্তু মনে পড়ে সব কথা। ওই যেখানে এখন জুঁই ফুলের গাছটা, ওখানে পুলিন দোপাটির চারা লাগাইয়াছিল। আহা কি ফুলই হইত। দেওয়াল চাপা পড়িয়া মরিয়া গেল গাছগুলি, আর হইল না। আর লক্ষ্মী? লক্ষ্মী সবে পুতুল খেলা শিখিতেছিল, বাক্সটা এখনো তোলা আছে সিন্দুকে। আহা কি আনন্দই না করিত আজ পুলিন লক্ষ্মী থাকিলে। মানুষ জনের কি ন্যাওটাই ছিল।

শূন্য ভিটায় প্রাণ যেন খাঁ খাঁ করে। কর্তা কী স্বার্থপর, কেমন পুলিন লক্ষ্মীকে লইয়া স্বর্গে সংসার পাতিয়াছেন। তাঁহাকে বুঝি দরকার হয় না। বেশ তিনিও আবার সংসার পাতিবেন চিন্তার মামাতো ভাইবোনেদের লইয়া। হে মা কালী, চিন্তার মামারা যেন চলিয়া না যায়। খাওয়ানোর ভাবনা আছে আজকালকার দিনে। তা চিন্তার মামা কি আর কিছু আনিবে না টাকা পয়সা। নাই বা আনিলো, পুরুষ মানুষ, কিছু একটা জোগাড় করিয়া লইতে পারিবে। কখন আসিবে কে জানে, কলকাতা হইতেই আসিবে নিশ্চয়। ট্রেণ তো ছুটায়। এখানে আসিতে সেই ঝিকিমিকি বেলা। সন্ধ্যার কোলে কোলে। ভাবিতে ভাবিতে ভোরের দিকে এক সময় ঘুমাইয়া পড়ে বুড়ী।

ওমা এত বেলা হয়ে গেল, বাড়ীতে আজ মানুষ আসিবে, ধড়মড় করিয়া জাগিয়া ওঠে ঘোষাল বুড়ী। কত কাজ বাকী। ওঘরখানা ঝাড়পোঁছ করিতে হইবে। চাল চাট্টি আনিতে হইবে বিনোর মার কাছ হইতে। চাষা-বাড়ী হইতে গুড় আলু যোগাড় করিতে হইবে। বাঁ হাতের ব্যথাটির কথা ভুলিয়া যায় বুড়ী।

কাজ আর কি? হইয়া গেল বারোটার মধ্যে। রান্না করিয়া রাখিতে ভরসা হয় না। কী জানি এবেলায় ভাত খায় কিনা ঠিক নাই। কোনমতে চোখে মুখে চাট্টি গুঁজিয়া ঘর বার করে ঘোষাল

বুড়ী। বেলা আর পড়ে না। ঘরে বসিয়া বসিয়া বিরক্ত হইয়া ঘোষাল বুড়ী বাঁড়ুয্যে বাড়ী যায়।

হ্যাঁলা মেজগিন্নী, কটা বাজলো একবার দেখতো বাছা?

ঘড়ির সন্ধান ঘোষাল বুড়ীর এই প্রথম। মেজগিন্নী পানের পিক ফেলিয়া বলে, ঘড়ি কী হবে গা দিদি? তোমার আবার ঘড়ির দরকার হ'লো কিসে?

অ-মা জানিস্ নে তোরা? আমার চিন্তার মামা মামীরা সব আসছে যে লা আজ সেই পাকিস্তান থেকে। এখানে থাকবে যে আমার কাছে।

চিন্তা আবার কে গা দিদি তোমার, শুনিনি তো কখনো। পাকিস্তানে আবার তোমার কুটুম কে ছিল গা?

অমা, আমার ন' দেওরের পেতম পক্ষের ছেলে ছিল যে গা চিন্তা। কতদিন তো বলিচি তোকে।

মেজ গিন্নীর মনে নাই কবে ঘোষাল বুড়ী তাহার দেওরপোর গল্প করিয়াছে। শুনিতে চাহিলে আবার ইতিহাস ফাঁদিবে বুড়ি। ঘড়ি দেখিয়া বলে, এই তো সবে তিনটে, তোমার সেই আসতে গিয়ে সাড়ে পাঁচটা ছ'টা।

ঘোষাল বুড়ী বলে, ও মেজগিন্নী, যাস বাপু তোরা, আমরা সব সেকেলে নোক, কি জানি,—কই, ছোট বৌকে দেখছি না যে লা, সে কোতা গেলো?

দেখো গিয়ে যাও রান্নাঘরে। সাহেবের বেটী, চা চাই না? তিনটে যে বাজলো।

মেজগিন্নী বইটা আবার টানিয়া লইয়া ভাবে, আদিখ্যেতা দেখো বুড়ীর। কোথাকার কে দেওরের শালা, তাও প্রথম পক্ষের, তাঁরা আসছেন পাকিস্তান থেকে বৌ ছেলে নিয়ে। তার আহ্লাদ দেখো। বুঝবে বুড়ী ঠ্যালা, কিচির মিচির বাঙালের পাল্লায় পড়ুক একবার।

চায়ের নামে ঘোষাল বুড়ীর মনে পড়িয়া যায়, একটু জোগাড় রাখিলে হইত। বলে,—দেখি, এলাম একবার যখন, দেখা করে যাই।

মেজগিন্নী খোঁটা দিয়া বলে, তোমার আবার চায়ের নেশা হলো কবে থেকে ?

আমরণ, আমি আবার চা খাবো কি লা ? বুড়ী হাসে।

অন্য দিন হইলে বোধ হয় কুরুক্ষেত্র বাধিয়া যাইত। মেজগিন্নী অবাক হয়।

ছোট বৌকে এই সময়টা রোজ একা একাই চা খাইতে হয়। একটা কথা বলিবার লোক পাইয়া খুশী হয় সে। হোক না সে ঘোষাল বুড়ীই। আপ্যায়ন করে, ও দিদি, কী ভাগ্যি আমার, বোসো বোসো। আজ কিন্তু তোমাকে চা না খাইয়ে ছাড়ছি না আমি। খাওনা একটু, এতো আর আঁস নয়। দেখবে, শরীর মন সব ভাল হয়ে যাবে।

ঘোষাল বুড়ীর ভালো লাগে এই কলেজে পড়া মেয়েটিকে।— দূর মুখপুড়ী, সাতকাল গেলো এখন চিতেয় চড়ে চা খাবো কি লা ? তা শোন আমাকে—হঠাৎ চা চাওয়াটা কি ঠিক হইবে ভাবিয়া কথাটা ঘুরাইয়া নেয় বুড়ী—মানে আমার সেই চিন্তার কথা বলতাম না, সেজ দেওরের পেতম পক্ষের ছেলে লা, হ্যাঁ সেই, ওর মামা মামীরা সব পাকিস্তান থেকে আসছে, আমার কাছে থাকবে বলে। যাস বাপু তোরা, আলাপ সালাপ করিস। আমি তো আবার সেকেলে গেঁয়ো ভূত। কী বলতে কী বলি, হয়তো কথাই বুঝবো না ওদের।

ছোট বৌ চোখ বড় বড় করে তাকায়—ওমা তাই নাকি ? তোমার আবার আত্মীর কুটুম ছিল নাকি পাকিস্তানে। বেশ করেছো দিদি আসতে লিখে দিয়ে ? ওখানে আবার হিন্দু কেউ থাকে নাকি দিদি, আমার জানাশোনা সবাই কবে চলে এসেছে। নিশ্চয়ই যাবো দিদি আমি, আমার বাঙাল কথা বলা অভ্যেস আছে। কিছু ভেবো না তুমি।

যাস্ কিন্তু ঠিক। হ্যাঁ, ও বৌ শোন, ভাবছিলাম কি, কী জানি বাপু ওরা আবার চা ফা খায় কি না। আমার তো ওসব পাট নেই।

ওমা তাতে কি হয়েছে, নিয়ে যাওনা খানিকটা চা চিনি। দুধ, তোমায় ছাগলটাকে একটু দুয়ে নিও এখন। কেটলি না থাকে তো কি হয়েছে, ডেকৃচি টেকৃচিতে করে জল গরম করে নিও। ও সে তারাই নেবে এখন, যার নেশা সে বুঝবে। এই আমার দেখো না, দুপুরবেলা রান্নাঘরের গরমে বসে ভাপ্ছি।

ছোট বৌ-র কাছে চা চিনি লইয়া বুড়ী ওঠে, যাস্ কিন্তু মা, ওমা তুই যে বুন লা, মরণ দেক আমার। যাস্ কিন্তু ঠিক বুজলি?

বাড়ী ফিরিয়া বুড়ী আর একবার দাওয়াটা ঝাঁট দেয়, তারপর রওনা হয় ইস্কুল ঘরের দিকে। গাড়ী আসিলে এই দিক দিয়াই আসিবে। একখানা করিয়া গাড়ী দেখে আর আগাইয়া যায় বুড়ী, কোতা যাবে গা? গাড়ী চলিয়া যায় অন্য গ্রাম। আর গাড়ীই বা কখানা। খান পাঁচ ছয় গেল সন্ধ্যা পর্যন্ত। বুড়ী হতাশ হইয়া পা বাড়ায় বাড়ীর পথে। সন্ধ্যা উৎরাইয়া গেল, ভিটার প্রদীপটুকু তো জ্বালিতে হইবে। অন্ধকারে ঠাহর হয় না ঠিক। তবু গ্রামের চেনা রাস্তা, লাঠি ঠুকিয়া ঠুকিয়া বুড়ী চলিতে থাকে।

বাঁড়ুয্যে বাড়ীর কাছে আসিতে বিপিন বিড়িটা আড়াল দিয়া বলে, ও পিসি কোথা ছিলে গো এতক্ষণ, তোমার বাড়ীতে যে লোক এসে বসে রয়েছে তখন থেকে।

বুড়ী যেন চাঁদ হাতে পায়, এয়েচে? এয়েচে ওরা সব? ওমা কোতা দিয়ে এলো গো, আমি যে সেই ইস্কুল ঘরে বসে আচি বিকেল থেকে, দেক দিকি। দে বাবা এটুকু পার করে দে। আহা বেচারারা কষ্ট পাচ্ছে তখন থেকে।

বেড়ার ধারে বসিয়া আছে তিনটি মানুষ!—অ-ভাই আমার, ও বোনটি, কখন এলে গা তোমরা? আমি ইদিকে সেই ইস্কুল ঘরে বসে আছি। মরণ আমার।

হরসুন্দর, সরমা, মেয়ে গায়ত্রী প্রণাম করে ঘোষাল বুড়ীকে। থাক থাক বেঁচে থাকো, চিরএয়োস্ত্রী হও। আহা কত কষ্টই হয়েছে

তোমাদের, চলো ঘরে এসো সব। আহা ইটি বুজি মেয়ে, বিয়ে দাওনি এখনো ? আহা চিন্তারে, কোথা গেলি বাপ আমার, পুলিন লক্ষ্মীরে— বুড়ীকে ধমক দেয় বিপিন, ও পিসি কেঁদো পরে বাপু, যাও এদের ভেতরে নিয়ে যাও, হাত মুখ ধুক, তিষ্টুক একটু। বুড়ী চোখ মুছিয়া তালা খোলে।

দুএকদিনেই গুছাইয়া বসে সরমারা। পাকিস্তান হইতে কিছুই আনা যায় নাই। কিছু গিয়াছে লুট হইয়া, কিছু রাস্তায় কাস্টম্‌সে আটকাইয়াছে। থাকার মধ্যে শ'দেড়েক টাকা, পুরাতন কাপড়-জামা, আর বিছানা বাসন কিছু। ঘোষাল পরিবারের তুলিয়া রাখা সংসারটি সিন্দুক-সিকা-ভাঁড়ার ঘর হইতে নামাইয়া আনে সরমা। তবু যেন মন বসে না, এ কাহার সংসার, কাহার দয়ায় বাঁচিয়া থাকা ? ক'টা দিন কে জানে ? বুড়ী আদর আহ্লাদ করে বৈকি, তবু মাঝে মাঝে যখন বিনাইয়া বিনাইয়া কাঁদে, রাগিয়া উঠিয়া ধমক দেয়, মনে লাগে সরমার। পরের বকুনি খাইয়া ভাগ্যকে ধিক্কার দেয়!

কিন্তু তবু তো একটা আশ্রয়। আরো হাজার জনের মত স্টেশনে ক্যাম্পে কাটাইতে তো হয় নাই। সরমা মানাইয়া লইতে চায়, বুড়ীকে খুসী করিতে চায়।

গ্রামের মেয়ে-বৌরা আসে পাকিস্তানের দাঙ্গা-খুনোখুনির গল্প শুনিতে। সরমা তাহার শ্বশুরবাড়ী, বাবার ভিটার কলঙ্কের কথা বলিতে পারে না।

কেন পালিয়ে এলেন আপনারা ?

কী করুম, থাকতে পারলাম না।

কতগুলো খুন হয়েছে আপনাদের গাঁয়ে ?

চার-পাঁচটা অইবো।

সব লুট হয়ে গেছে, নাগো ঢাকার বৌ ?—তা অইচে অনেক।

লোকগুলো ভারী পাজী না ?

হ, খুইন্যা বদমাস। ভালো মানুষও আছে দুচারডা।
এমনি ধারা জবাব দেয় সরমা গায়ত্রী।
তা হ্যাঁগা, মেয়েমানুষের ওপর জোরজবরদস্তি কেমন হয়েছে? বাঁড়ুয্যেদের মেজবৌ শুধায়।
সরমা বলে অইচে দিদি, তাও অইচে। এই হগ্‌গল কথা জিগাইবেন না আমাগো।
ঘোষাল বুড়ীভারী খুসী, তাহার বাড়ীতে এখন দুপুরবেলায় আড্ডা বসে, কত লোক, জমজমাট। আপ্যায়ন করে পান দিয়া।
গায়ত্রীকে বলে, তোরা এখানে কী করচিস্? যা না পান নিয়ে আয় না। গায়ত্রী অমলা উঠিয়া গেলে মেজবৌকে বলে, তুই যেন কী, মেজবৌ, সোমত্ত আইবুড়ো মেয়েদের সামনে ওই সব কতা বলতে আছে নাকি? মেজবৌ বলে, তাতে আবার কী হয়েছে? মেয়ে বড় হলেই মায়ের সমান। আমাদের ওই বয়েসে ছেলে হয় নি দুটো। বলো নাগো পাকিস্তানের বৌ, কী কী হয়েছে তোমাদের গাঁয়ে।
সরমা মুখ খোলে না, ওই কথা জিগাইবেন না আমাগো।
হতাশ হইয়া ফিরিয়া যায় মেয়ে-বৌরা। মুখরোচক গল্প জমে না। মেজবৌ বলে, বড় দেমাকী ওই বাঙালনী, দেখলে তো দিদি। বুড়ীর হাড়ে ঘুণ দিয়ে ছাড়বে ও, বলে দিলাম আমি। ভট্‌চাজগিন্নী বলে, ঢং দেখে বাঁচিনে, আ মরণ, নজ্জা দেখে বাঁচিনে। নিশ্চয় জবর কিছু হয়েচে, নইলে অমন ঢাক ঢাক কেনে। আমরা তো আর ঘাস খাইনে। বাঁড়ুয্যেদের ছোটবৌ বলে, আপনাদের যেন কেমন কথা। মানুষটা এত ধকল খেয়ে এসেছে, ঘর-বাড়ী খুইয়ে—। অমলা সায় দেয় ছোটবৌয়ের কথায়। বেশী কথা বলবার সাহস নেই, মা আছে পিসী আছে।
হরসুন্দর সারাজীবন মাস্টারী করিয়া কাটাইয়াছেন। দশবিঘা জমিও ছিল। এক মেয়ে লইয়া দিন ভাল ভাবেই চলিয়া যাইত। কিন্তু এবার? জমিও নাই, মাস্টারিও নাই। অকূল পাথার, চিন্তা

করেন সারা দিনরাত। পাতানো দিদির উপর ভর করিয়া কতদিন থাকা যায়? যত দিন যায়, শংকিত হইয়া ওঠেন। বুড়ীর রকমসকম মাঝে মাঝে কেমন হইয়া উঠিতেছে। এগ্রাম ওগ্রাম ঘুরিয়া চাকরীর সন্ধান করেন, কাগজ দেখিয়া দেখিয়া দরখাস্ত করেন। দিন একটি একটি করিয়া গড়াইয়া যায় আশায় দুরাশায়!

বাবা-মার মুখের দিকে চাহিয়া গায়ত্রীর কথা যেন শুকাইয়া যায়। ফেলিয়া আসা গ্রামের নূতন পুরাতন স্মৃতি মিলিয়া পিষিয়া ফেলে তাহাকে। হাসিখুসী উচ্ছল মেয়েটা ধীর শান্ত হইয়া গিয়াছে আশ্চর্য রকম। বয়সের তুলনায় কত বুড়াইয়া গিয়াছে গায়ত্রী। অমলা বলে, তুমি কি হাসতে জানো না নাকি? চেষ্টা করিয়া হাসে গায়ত্রী,—এই তো হাসি। হ্যাঁ, এমনি ধারা হাসে নাকি মানুষ—অমলা রাগ করিয়া 'মানুষ' করিতে চায় নতুন সখীকে। গ্রামে তাহার পুরাতন সখীদের সবারই বিবাহ হইয়া গিয়াছে।

একটি ছেলের সঙ্গে আলাপ হইয়াছে গায়ত্রীর। গাঙ্গুলীদের দেবু। গ্রামের ছোট লাইব্রেরীটির সেক্রেটারী সে, বই আনিয়া দেয় মাঝে মাঝে। গায়ত্রী জানে, বই আনা ছাড়াও আর একটি কাজ আছে তাহার এ বাড়ীতে। অমলার সঙ্গে দেখা করিতেই সে আসে। কয়েকদিন ধরিয়া অমলা বিকালের আগেই চলিয়া যায়, কী জানি কেন। দেবু আসিয়া ফিরিয়া যাইতেছে। এটা ওটা গল্প করিতে করিতে হঠাৎ একসময় গায়ত্রীর হাতে একটুকরা কাগজ গুঁজিয়া দিয়া বলে, এটা অমলাকে দিয়ে দেবেন, পায়ে পড়ি কাউকে বলবেন না যেন। তারপর লজ্জায় ছুটিয়া পালায়।

বুড়ী দাওয়া হইতে দেখিতে পাইয়া ঠক ঠক করিয়া আগাইয়া আসে, বলি এসব কি হচ্ছে য়াঁ? সোমত্ত ছেলের সঙ্গে এত ফষ্টিনষ্টি কিসের লা আইবুড়ো মেয়ের? পিদীম দেয়া নেই, ঠাকুর দেবতার নাম নেওয়া নেই। মস্করা হচ্ছে সন্দেবেলা—

গায়ত্রী বলে, মিছামিছি বকো ক্যান্ পিসীমা, কিচ্ছু করি নাই আমি।
বুড়ী আরো রাগিয়া গিয়া বলে, স্বচক্ষে দেকলাম গুজুর গুজুর করচিস্ তুই, আবার মিথ্যে কতা। বলি হুঁস নেই তোর? সময়কালে বিয়ে হলে চার ছেলের মা হতিস্ যে। ফের যদি কোনদিন দেকিচি ও ছোঁড়াকে এ বাড়ী ঢুকতে তো ঠ্যাং ভেঙে দেবো আমি। এসব ইল্লুতেপনা আমার বাড়ীতে চলবে না বলে দিচ্ছি, হ্যাঁ।
গায়ত্রী হঠাৎ ধৈর্য হারাইয়া ফেলে, যা তা কথা কইয়ো না পিসি, কী করছি কি আমি? ভদ্দরলোকের পোলার সাথে কথা কওনে অপরাধটা কি অইচে? রোজই তো কই আমি।
ও হারামজাদী, রোজ আসে ও, রোজ আসে? রোজ নাগর নিয়ে রঙ্গ হয় তোমার, আমার বাড়ীতে বসে? পীরিত? বেরো বল্‌ছি আমার বাড়ী থেকে, হারামজাদী, শতেক খোয়ারী ধিঙ্গী কোথাকার, ছেনালী—রাগে বুড়ীর মুখ দিয়া কথা সরিতে চাহে না।
সরমা চেঁচামেচি শুনিয়া রান্নাঘর হইতে বাহির হইয়া আসে। বুড়ী ক্ষেপিয়া গিয়াছে, এ আশ্রয়টুকুও যায় বুঝি। ঠাস্ করিয়া একটি চড় বসাইয়া দেয় মেয়ের গালে।
গায়ত্রীর গোরুর মত বড় বড় সকরুণ চোখে প্রতিবাদ দেখিয়া সরমা যেন ক্ষেপিয়া যায়।—
মরণ হয় না তর, হতভাগী। মরিস্ না ক্যান্ তুই? মরিস্ না ক্যান্? তরে লইয়া যত জ্বালা আমাগো। ছ্যাশ বাড়ী ছাইড়া আইলাম, এহেনে আবার শুরু করছস্! চুলের মুঠি ধরিয়া পাগলের মত মারিতে থাকে সরমা। গায়ত্রী পড়িয়া যায়।
অ বৌ করছ কিগা, সত্যিই মেরে ফেলবে নাকি মেয়েটাকে সন্দেবেলা। বুড়ী ছাড়াইবার চেষ্টা করে। গায়ত্রীর হাত হইতে একসময় দেবুর কাগজের টুকরাটা পড়িয়া যায়। ছোঁ মারিয়া তুলিয়া লয় সরমা চিঠিটা, এটা কী? দেখি দেখি কে কী লিখছে?
চিঠিটা পড়া যায় না সন্ধ্যার আব্‌ছা অন্ধকারে, তবু বোঝা যায়

নাম ছুটো। গায়ত্রীর প্রতিবাদের কারণ এবার বুঝিতে পারে সরমা। হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলে, কাম কি তর পরের চিঠি বওনের? নিজের জ্বালায় মরছস্ না তুই?
কার চিঠি বৌ, কার চিঠি? বুড়ী শুধায়।
ওই যে আপনাগো অম্লি, তারে চিঠি দিছে দেবু হ্যামড়া।
টলিতে টলিতে ঘরে যায় গায়ত্রী। ভীষণ লাগিয়াছে পড়িয়া গিয়া। বুড়ী সাধাসাধি করিয়া খাওয়াইতে পারে না রাত্রে। শরীর খারাপটা রাগ মনে করিয়া মাও আর বেশী জিদ করে না। নিজেরই লজ্জা করিতেছে এখন অতবড় মেয়েকে না জানিয়া শুনিয়া এইভাবে মারিয়া।

আকাশপাতাল ভাবে গায়ত্রী। তাহার জন্যই যত জ্বালা মা-বাবার। তাহার জন্যই চলিয়া আসা পিতৃ-পুরুষের ভিটা ফেলিয়া। আজ যে কাণ্ড হইয়া গেল, তাহার পর এখানেও আর থাকা যাইবে কিনা সন্দেহ। কোন্ আত্মীয়তার সূত্র ধরিয়া বাবা আবার আশ্রয় খুঁজিতে বাহির হইবে এই বৃদ্ধ বয়সে।···পেটটা ভীষণ মোচড় দিয়া উঠিতেছে, আর সহ্য করিতে পারে না বুঝি!···এই অপমান লাঞ্ছনা বহিয়া, মা-বাবার বোঝা হইয়া কতদিন বাঁচিয়া থাকা যায়।
পাকিস্তানের সেই দিনটির কথা মনে পড়ে। শিহরিয়া ওঠে গায়ত্রী। বুকের মধ্যে দম বন্ধ বইয়া আসে।···পেটটা যেন ঠেলিয়া উঠিতেছে বুক পর্যন্ত। আর বুঝি লুকাইয়া রাখাও যাইবে না। অসহ্য যন্ত্রণায় কাৎরায়।
হাতড়াইয়া হাতড়াইয়া দরজা খুলিয়া বাহিরে আসে—পিসীর যদি আফিম খাওয়ার নেশা থাকিত। হাতপা অবশ হইয়া গিয়াছে। দম লইবার জন্য একটু বসে এবার। হে ভগবান, এখনি যেন শেষ হইয়া যায় সব কিছুর। পুকুর ঘাট পর্যন্ত যাইতে পারিবে কিনা সন্দেহ, একটু যদি বিষ পাইত কোথা হইতে।

ধীরে ধীরে স্বপ্নের মত ব্যথাটা মিলাইয়া যায়। আঃ এই বুঝি মৃত্যু। খানিক পরে আবার অনুভব করে মরিয়া যায় নাই সে। যন্ত্রণাটা আরো বাড়িয়া গিয়াছে। হয়তো এমনি করিয়া ভুগাইবে সারারাত সারাদিন। প্রাণপণ চেষ্টায় পা বাড়ায় নীচের দিকে। অন্ধকারে ঠাহর হয় না, পড়িয়া যায় হুড়মুড় করিয়া।

সরমার ঘুম ভাঙ্গিয়া যায়, কে? কে? দরজা খুলিয়া বাহিরে আসিয়া দেখে গায়ত্রী মুখ থুবড়াইয়া পড়িয়া আছে। হাঁউমাউ করিয়া কাঁদিয়া ওঠে সরমা। ঘোষালবুড়ী, হরসুন্দরকে ডাকিয়া তুলিয়া ঘরে আনিয়া শোয়াইয়া দেয় গায়ত্রীকে। গায়ের কাপড় আলগা করিয়া দেয়। পেটের মধ্যে কী একটা ঠেলিয়া ঠেলিয়া উঠিতেছে।

ঘোষালবুড়ী তাহার দিকে তাকাইয়া শংকিত হইয়া ওঠে। একি বৌ, সব্বোনাশ, এ কেমন করে হলো গো? এতো বেশ বড়সড় দেখচি। হ্যাগো কোতা থেকে এ সব্বোনাশ এলো গো? ক্ষোভে দুঃখে বুড়ী কাঁদিয়া ফেলে। হরসুন্দর বাহিরে গিয়া উদাস দৃষ্টিতে তাকাইয়া থাকেন আকাশের দিকে।

কাঁদিতে কাঁদিতে সরমা গায়ত্রীর লাঞ্ছনার কাহিনী বলে। কিন্তু তাহা হইতে এই সর্বনাশ হইয়া গিয়াছে, বুঝিতে পারেন নাই তিনি। গায়ত্রী কেমন করিয়া লুকাইয়াছে মায়ের চোখকেও।

হঠাৎ পা দুইটা জড়াইয়া ধরে সরমা—অ দিদি, তোমার দুইট্যা পায় পড়ি, কইওনা কারে। বিষ আইন্যা দ্যাও, খাওয়াইয়া দিমু মাইয়ারে।

ঘোষাল বুড়ী বলে, বালাই'ষাট্, মেয়েকে মারবে কেনে গো? মেয়ের আমার অপরাধটা কি? বাচা, আমার একুনি সেরে উটবে।

ও দিদি, শ্যাকের পোলা যে মাইয়ার প্যাটে। মাইর‍্যা ফালাও দিদি, কাকপক্ষী ট্যার পাইবো না।

আমাকে আর শিকিও না বৌ, চারকুড়ি হতে চল্লো আমার। এই অবস্তায় নষ্ট করতে গেলে বাঁচে ককনো পোয়াতী। হোক্ না ছেলে, কেষ্টর জীব, দান করে দেবো মোছোলমানকে।

গাঝাড়া দিয়া উঠিয়া বসে বুড়ী।—নাও ধরো দিকি পিদিমটা।
মেয়েটাকে তো মেরে খুন করে ফেললে।

ঘরের কোণ খুঁড়িয়া বুড়ী বাহির করে একছাড়া সিঁদুরমাখা হার।
—তিলে কোবরেজ এসব ব্যাপারে ধন্বন্তরী, হলে কি হবে চামার
হারামজাদা টাকা ছাড়া কতা কইবে না। বাগে পেয়েছে একোন
আবার চেপে ধরবে।

লাঠিগাছা হাতে লইয়া হরসুন্দরকে ডাকে বুড়ী—অ হরো, এসো
দিকি আমার সঙ্গে। রাতবিরিত একা একা ঠাওর পাই না আঁদারে।
থাকতে পারবে তো বৌ? ভয় কি, আমরা এই এলাম বলে।

অনিবার্য

ঘরে দেখে খুশি হয়েছিল সীতা, ব্যবস্থা দেখে মুখ শুকিয়ে গেল। এই কোণটুকুতে, ওর সিন্ধী-পাঞ্জাবীদের সঙ্গে পাশাপাশি বসে রান্না করতে হবে, তাও কি না বেলা সাড়ে আটটার মধ্যে! আর কল-বাথরুম কিনা পাঁচজন নয়, সিন্ধী-পাঞ্জাবী-বাঙালী মিলেয়ে পঁচিশজন মেয়ে পুরুষের সঙ্গে একত্র!

চার বছরের চামেরি-বাসিন্দা পোড়খাওয়া বৌটি বললো, কী ভাই, পছন্দ হচ্ছে না বুঝি?

সীতা সোজাসুজি বলে ফেললো, কী করে আছেন দিদি আপনি?

সীতার মনে জ্বালা ধরিয়ে হেসে হেসে বৌটি বললো—আস্তে আস্তে সয়ে যাবে ভাই, কিচ্ছু ভাববেন না। এর নাম চামেরি, ফ্যামিলি কোয়ার্টার তো নয়, এমনিই ব্যবস্থা। আগে থাকতো ব্যাচিলররা, ঘর নেই কী করবে লোকে। গরমেণ্ট দিয়েছে, গরজ যাদের তাদের নিতে হয়েছে। সে সব শুনবেন ভাই পরে। মুখ-হাত ধুন এখন, আমার আবার ওঁর আসার সময় হল, যাচ্ছি ভাই।

সীতা ম্লান হেসে বললো, আচ্ছা।

আর একবার তাকিয়ে দেখলো সীতা। তিন কোণে তিনটে উনুন। দরজার পাশটায় বিরাট একটা ডাইনিং টেবিল, ইতস্তত কয়েকটা চেয়ার, একজনের একটা মীটসেফ। ভেতরের রান্নাঘরটা হল মেসের দখলে।

কোনমতে মুখহাত ধুয়ে ঘরে এসেই বিনা ভূমিকায় বলে ফেললো, পারবো না আমি এখানে থাকতে।

বিছানাপত্রগুলো খুলছিল প্রবীর, মুখ তুলে শঙ্কিত হয়ে বললো, কী হল ?

এ কোথায় হাটের মাঝখানে এনে ফেললে আমাকে ? ওখানে আমি রান্না করতে পারবো না।

ওঃ, এই ! আশ্বস্ত হয়ে প্রবীর বললো, দেখো না, অভ্যেস হয়ে যাবে আস্তে আস্তে। সবাই তো করে—

সীতার সুর নামলো না। নেয়ারের খাটটার ওপর বসে পড়ে বললে, করে বৈকি সবাই—ওই তো ওঁদের ওপরে আলাদা একটা ঘর আছে। এবার প্রবীরকে উঠতে হল কাজ ছেড়ে। বললে, ওদের না হয় আছে। এই সিন্ধী-পাঞ্জাবী ফ্যামিলিদের তো নেই।

সিন্ধী-পাঞ্জাবীরা করছে বলে আমাদেরও করতে হবে ?

শুরুতেই সীতা এমনি করবে কে ভেবেছিল।

প্রবীর এবার রাগতস্বরে বললে, সিন্ধী-পাঞ্জাবী নয় সবাই করে, চলো দেখিয়ে আনছি কত বাঙালী ফ্যামিলি রয়েছে।

সীতা বললো, যে পারে পারুক, অমি পারবো না, বলে দিলাম। উঠে জানালার ধারে চলে গেল সীতা।

যে রকম জেদী আর বাপ-মার আহ্বরে মেয়ে সীতা, এবার কেঁদে ফেলবে রাগে।

জানালার ধারে গিয়ে প্রবীর বললো, এই শুনছো, এখন থেকেই এমনি ঝগড়া শুরু করলে ? বেশ। তাহলে চলো রেখে আসি। সেই বছরে একবার যাবো।

সীতা মুখ না ফিরিয়েই বললো, তুমি এমন জায়গায় আনলে কেন আমাকে?

কী করবো বলো, এখানে যে বাসা পাওয়া যায় না, তবু তো ভালো, অন্য ফ্যামিলির সঙ্গে নয়। এই শোনো, জানালা থেকে সরে এসো, সামনের ঘর তিনটেই মেস।

সরে এল সীতা, মুখ ফেরালো না তবু। প্রবীর বললো, আহা, এত রাগছ কেন, কালই তো আর তোমাকে রান্না করতে হচ্ছে না।

চট্‌ করে এবার মুখ ফিরিয়ে অবাক হয়ে সীতা বললো, তবে খাবে কোথায় ?

কেন, এ কটা দিন মেসেই খাবো।

কেন, মেসে খাবে কেন ?

আহা, একটু গুছিয়ে টুছিয়ে নাও, তারপর তো, এ কটা দিন একটু বেড়িয়ে টেড়িয়ে নাও—

সীতাকেও এখুনি সত্যি কথাটা বলতে পারলো না প্রবীর। জানবে তো, যে কটা দিন না জানে তাই ভালো। স্বামীর কাছে আসতে না আসতেই টাকা পয়সার হিসাবটা না-ই করলো। সারা জীবনই তো এই করতে হবে এর পর।

খাঁটি হিসেবে এ ব্যবস্থা হয় না। মেসের গেস্ট চার্জের থেকে রেঁধে খাওয়ার খরচ অনেক কম পড়ে। কিন্তু মেসের গেস্ট চার্জ তো মাইনে পেলে দিলেই চলবে। ছ-মাসের তিলে তিলে বাঁচানো টাকাগুলো তো কলকাতা আসা যাওয়াতেই খরচ হয়ে গেছে। সে কথাটা আভাসে ইঙ্গিতে হয়তো বুঝেছে সীতা, কিন্তু প্রবীরের কাছে যে গোটা ত্রিশ টাকাও নেই সংসার পাতার সে কথাটা তো জানে না।

সীতা খুসি হল কাল থেকেই ওই ভিড়ে ঢুকতে হবে না বলে। তবু নিজের সংসার পাতাটা ক'দিন পিছিয়ে গেল বলে একটু অসন্তুষ্টও হল বোধ হয়।

প্রবীর ঠিক বুঝলো না, সীতার মুখের ওপর থেকে মেঘটা কেটে গেছে দেখে খুশি হল। কাছে টেনে নিয়ে বললো, হলই বা ওখানে রান্না, রান্না তো দুটো লোকের, সকাল বিকেল এক'এক ঘণ্টাই যথেষ্ট। বেশী হাবিজাবি করবে না, এক তরকারী ভাত, রাত্রে রুটি, তাও যদি অসুবিধে হয় ভাতই করবে। সারাদিন রান্না নিয়ে থাকে বলেই তো বাঙালী মেয়েদের চেহারা এমনি। বিকেলে আমি ফেরার আগে রান্না সেরে নেবে, চা-টা খেয়ে বেড়াতে বেরিয়ে যাবো রোজ, কেমন ? আর এ ক-দিন তো রান্নার পাটই নেই।

রোজ রোজ বেড়ানোর নামে খুশি হয়ে উঠলো সীতা। মুখটা তুলে বললো, ঠিক যাবে তো রোজ।

: যাবো না? রোজ একা একা বেড়ানোর সময় তোমার কথা এত ভাবতাম—

: ইস্!

ঠিক এই সময় দত্তর গলা শোনা গেল।—মিত্তির এসে পড়েছ নাকি হে।

প্রবীর বললো, এসো হে চলে এসো।

সামনের দিকে উঠে এল প্রবীর। দত্ত ঘরে ঢুকে বললো, যাক নিয়ে এলে তাহলে শেষ পর্যন্ত। কই বৌদি কোথায়?

আলাপ করিয়ে দিয়ে প্রবীর বললো, এঁরই দয়ায় আসতে পারলে, বুঝেছো। নিখিল দত্ত, এই ঘরের মালিক। তোমার জন্যে পাশের ঘরে উঠে গেছেন।

দত্ত বললো, আহ্ হা দয়া আর কি? সৌরেনের ঘরে খাট একটা পড়ে রয়েছে, আমার আর অসুবিধা কি, একা মানুষ তো। এখন তো এক বছরের মত—।

সীতা বললো, ও, আপনার স্ত্রীকে বুঝি পাঠিয়ে দিয়েছেন। দত্ত বললো, হ্যাঁ এই তিন বছর পরে গেল—একবার এখানে এসে পড়লে, যাওয়া আসা কি সোজা কথা। একবার গেলে, অন্তত বছরখানেক বৈ কি। এ ক-দিন মেসেই খাচ্ছেন তো, না?

প্রবীর বললো, হ্যাঁ ভাঙা দিন কটা আর—

দত্ত বললো, নিশ্চয়ই। একটু ধাতস্থ হতে দাও আগে, নতুন জায়গা জেনে শুনে নিন। তোমার বৌদি ছেলেপিলে সুদ্ধ এসেও চারদিন এই মেসেই—সে তো তুমি জানো।

প্রবীর বললো, হ্যাঁ, সেই তো ভেবে দেখলাম। চা-খাওয়া হয়েছে তোমার?

: আমি তো এই ফিরলাম। দেখি শেরসিঙের দয়া হবে কিনা।

প্রবীর বললো, এত দেরী যে।

দত্ত বললো, আর বলো কেন, এক নতুন অফিসার এসেছে। কেবল এটা বুঝিয়ে দেন, এ ফাইলটা দেখান তো, ড্রাফটটা আজই করে দিলে পারতেন না? নতুন এসেছে কিনা, সাড়ে ছটা পর্যন্ত কাজ করছে। আরে তুই বাপু অফিসার মানুষ, তোর পোষায়, আমাদের তো মাইনে দিস ক-টাকা, পাঁচটার পর খাটবো কেন? অথচ অফিসার বলছে, না-ও করা যায় না।

দত্তর পরে মেসের বন্ধুরা হৈ হৈ করে এসে আলাপ করে গেল একবার।

সীতা অস্বস্তি বোধ করে, প্রথম দিন এল সবাই আলাপ করতে অথচ এক কাপ চা-ও দেওয়া গেল না। নিজের ব্যবস্থা না করার জন্য এবার একটু রাগ হয় সীতার।

আড্ডার পর খাওয়া চুকতে চুকতে এগারোটা বেজে গেল।

সীতা কিছুতেই সবার খাওয়া শেষ হওয়ার আগে খেল না। খেতে বসে বললো, আমার কেমন লজ্জা করছে, এই টেবিল চেয়ারে বসে খেতে।

প্রবীর বললো, কেন চা খাও না!

: সে তো চা। তাই বলে এমন করে ভাত খাওয়া যায় তোমার পাশে টেবিলে বসে। খানিক পরে আবার নিজেই বললো, বেশ মজা লাগছে কিন্তু।

প্রবীর হাসলো, আমি জানি।

: কী করে জানলে তুমি।

: নিজে নিজে রান্না না করতে হলে খুশি হয় মেয়েরা সেকি আর আমি বুঝি না। আমাদের মতো তোমাদের তো রবিবারে ছুটি নেই, সুতরাং আরো বেশী খুশি হবার কথা।

সীতা ইস্কুলের মেয়ের মতো চোখ নাচিয়ে বললো, ঠিকই তো, এখনো ছ-দিন ছুটি। মেনি থ্যাঙ্কস।

প্রথম দিন লোদী গার্ডেন, দ্বিতীয় দিন সফদারজঙ্, পর দিন নিজামুদ্দিন, হুমায়ুনের কবর দেখার পর উচ্ছ্বসিত হয়ে সীতা বললো, কাল কুতুব আর রেড ফোর্ট তো ?

প্রবীর বললো, দাঁড়াও না, পালিয়ে তো যাচ্ছে না।

সীতা আবদারের সুরে বললো, না, লক্ষ্মীটি, কাল রবিবার আছে, চলো না।

রবিবার ছাড়া অতদূরে যাওয়া যাবে না সে কথাটা আগেই বলেছিল প্রবীর। বললো, দাঁড়াও এই সবে ফুল টুল লাগাচ্ছে, আরো ক-দিন যাক্—আর সব হুটহাট করে দেখতে নেই, একটা একটা করে দেখলে, তবে তো ভালো লাগবে।

ঃ ইস্ ভালো আবার লাগবে না। আমার তো অবাক লাগছে। সত্যি নবাবী একেই বলে। দেখেছো কী বিরাট তৈরি করেছে সব তখনকার দিনে ? কংক্রীট নয়, একখানা কড়ি বরগা পর্যন্ত নেই। চলো না কালই, আমার আর বাপু ধৈর্য থাকছে না।

পকেটের কথা মনে করে প্রবীর মনে মনে দীর্ঘনিশ্বাস ফেললো একটা। বললো, হবে হবে, ব্যস্ত হচ্ছো কেন, দিল্লী এসেছ যখন, সব দেখবে।

সীতা হঠাৎ বললো, আচ্ছা তাজমহলটা কেমন বলো তো ?

প্রবীর হেসে বললো, তার মানে তাজমহলটা শিগগির শিগ্‌গির দেখাও এই তো।

সীতা বললো, বাঃ, দেখাবে না নাকি ভেবেছো তুমি ?

প্রবীর বললো, দেখাবো বৈকি।

মাইনেটা পেয়ে ধার শোধ করতেই চল্লিশ টাকা বেরিয়ে গেল, ভাগ্যিস্ ভাড়াটা এখুনি দিতে হবে না। প্রবীর হিসেব করে দেখলো টায়ে টায়ে চলে যাবে কোনরকমে। কষ্ট হবে বৈকি, তবে সীতাকে এ মাসটা এড়িয়ে গেলেই চলবে। দিল্লীর এই একটা সুবিধে, ধার

পেতে কোন অসুবিধা নেই, মাসের পনের তারিখের পর স্বচ্ছন্দে ধার পাওয়া যায়, বিশেষ করে এই চামেরি পাড়ায়। আর ক'দিন পরেই তো মুদী দোকান থেকে শুরু করে মাছ সবৃজি পর্যন্ত বাসায় পৌঁছে দিয়ে যাবে ধারে।

সীতা আস্তে আস্তে গুছিয়ে নিল, এমন কি সিন্ধী আর পাঞ্জাবী ফ্যামিলি ছুটির সঙ্গেও ইংরেজি বাংলা হিন্দী মিশিয়ে আলাপ শুরু করলো। খারাপ লাগছে না মোটেই, প্রথম দিকের অস্বস্তিটা কেটে গেছে। মেসের মেম্বাররা যথেষ্ট ভদ্র। সমীহ করে চলে। আর পৌনে দশটা থেকে পাঁচটা সওয়া পাঁচটা পর্যন্ত তো মেয়েদেরই একচ্ছত্র আধিপত্য। খানিকটা ঘুমিয়ে, খানিক বই পড়েও সময় কাটে না, সুতরাং যত খুশি বেলা বাড়িয়ে খাওয়া সারে। দশটা থেকে একটা পর্যন্ত গল্প আড্ডা, দিল্লীর খুঁটিনাটি খবর শোনে।

সেদিন রাত্রে সীতা বললো, সংসারের গিন্নী কি তুমি না আমি?

প্রবীর বললো, কেন বলো তো?

ঃ তুমি যে বড়ো খরচপত্র দিলে না আমাকে।

ঃ বাঃ জিনিসপত্র বাজার তো আমিই এনে দিচ্ছি।

ঃ সে তো দিচ্ছ, কিন্তু আমি যা বলে দেবো তাই করবে এই তো নিয়ম। আবার এখানে তো বাজারও মেয়েরা করে।

প্রবীর বললো, দাঁড়াও প্রথম মাসের ধাক্কাটা সামলে নিই, পরের মাস থেকে দেব।

বেশ, তবে আমার হাত খরচ দাও।

টানাটানি খুবই। তবু এর মধ্যে কুতুব আর রেড ফোর্টটা না দেখে কিছুতেই ছাড়বে না সীতা। পরের রবিবার যেতেই হল। আর বৌ নিয়ে বেড়ানোর বাড়তি খরচও আছে। মোটমাট গোটা পাঁচেক টাকা বেরিয়ে গেল। মাসের পনের তারিখের পর প্রবীর দেখলো সিগারেট খরচাটা না কমালে শেষ পর্যন্ত টানা যাবে না বরুণের ধারের টাকাটা ধরেও।

সব্‌জিটা সস্তা এ সময়, মাছটা যদি ক-দিন বাদ দেওয়া যায়, তবে হয়তো চলে যাবে।

প্রথম দু-দিন কিছু বললো না সীতা, তিন দিনের দিন বললে, আজ কিন্তু মাছ এনো যেন।

প্রবীর বলল, হ্যাঁ।

আবার তিন-চার দিন বাদ গেল। পরের দিন সীতা বাজারের থলিটা দেখে বললো, তুমি কি মাছ খাওয়া ছেড়ে দিলে নাকি?

প্রবীর মাথা চুলকে বললো, ক-দিন ভালো মাছ পাচ্ছি না।

পরদিন আবার আধপো মাছ আনলো প্রবীর, সব্‌জিটা একেবারে বাদ।

দিল্লীর দ্রষ্টব্যগুলো ফুরিয়ে যেতে সীতার আগ্রা যাওয়ার বায়নাটা প্রবল হয়ে উঠলো, কই যাবে না আগ্রা।

প্রবীর বলে, দাঁড়াও-না, মাঘী পূর্ণিমায় যাব।

সীতা বলে, আমার কিন্তু আর ধৈর্য থাকছে না, খালি এমাস নয় ওমাস নয় করছো। সামনের মাসে যাবই কিন্তু।

প্রবীর বলে, আচ্ছা।

: চুপচাপ বসে বসে ভালো লাগে না। একটা সিনেমা দেখাও তাহলে।

প্রবীরকে ধার করেই সিনেমা যেতে হল, আগ্রার প্রোগ্রাম চাপা দেবার জন্যে।

সেদিন মাছ না দেখে সত্যিই রেগে গেল সীতা।—কী ভেবেছ কি তুমি। আজকেও মাছ আনলে না, কী খাবে খেও, আমি জানি না।

কেন? এত তরকারী রয়েছে—।

সীতা বললো, আজ সধবা মানুষ মাছ না খেলে হয়? তুমি যেন কী!

কেন? কী ব্যাপার! সবিস্ময়ে প্রবীর শুধালো।

: আহা কিছু যেন জানো না আজ, বলতে নেই, একাদশী নয় ?

ওহ, এই ? হো হো করে হেসে উঠলো প্রবীর। আমি ভাবলাম বুঝি অন্য কোন ব্যাপার।

আ-হা-হা, তুমি যেন কী ! একটু হেসে গম্ভীর হয়ে সীতা বললো, না বাপু, এসব জিনিস নিয়ে ঠাট্টা ইয়ার্কি আমার ভালো লাগে না। এখন যা হয় হোক, রাতে কিন্তু আজ মাছ ডিম যা হয় এনো।

প্রবীর বললো, আনবো। কিন্তু যাদের ভাতই জোটে না, তারা কি করে সীতা ? তারা মাছ ডিম পায় কোথা থেকে ?

প্রবীরের সুরে বুঝি একটু বেদনার রেশ ছিল, সীতা চোখ তুলে শোনার চেষ্টা করলো, তারপর বললো, তা আমি জানি না, আমি মোট কথা পারবো না।

আবার সেদিন পাঁচটা টাকা ধার করলো প্রবার।

পরের মাসে মাইনে পেয়ে ঘরের ভাড়া আর ধারগুলো শোধ করে প্রবীর চমকে উঠলো, হাতে আছে মাত্র তিরিশ টাকা। একটা মাস চলবে কী করে ?

সীতা বললো, কই আমার টাকা দিলে না ?

প্রবীর বললো, তুমি কোনদিন সংসার চালিয়েছ ? একটু জেনেশুনে নাও, চিরকাল তো আদুরে মেয়ে হয়েই কাটিয়েছ।

সীতা বললো, ইস্, তোমার চেয়ে কমে চালাতে পারি আমি, দেখো না।

প্রবীর বললো, আর একটা মাস যাক্ না।

: উঁহু, তুমি বলো কততে চালাতে হবে। দেখো, তার মধ্যে পারি কিনা।

প্রবীর বললো, তুমি বলো কতয় পারবে।

: শুধু সংসারের জন্যে ?

: হ্যাঁ।

: একশো টাকা দাও, সিগারেট-টিগারেট তোমার, বাসভাড়া, এসব কিন্তু বাদ।

প্রবীর বললো, মাইনে পাই ছুশো পনেরো, মন্টুদের দেবো পঞ্চাশ, ঘরভাড়া দেবো চল্লিশ, তাহলে আমি হেঁটে আপিস যাবো বলো? আর আপিসে চা-ও খাবো না?

লজ্জিত হয়ে সীতা বললো, বেশ আশি টাকা দাও তুমি।

প্রবীর বললো, দেবো। কিন্তু মুদির দোকানেরটা তো আমিই এনে দেবো, তোমাকে তাহলে ত্রিশ টাকা খরচ দেবো, কেমন তো?

সীতা বললে, উঁহু তা হবে না, মুদির দোকানে কী কত লাগবে, সে আমি হিসাব করে দেবো।

মেসের ম্যানেজারী করেছে ক-মাস, দোকানদারের সঙ্গে আলাপ আছে। সে বললে, কোই বাত নেই, সাব, যেতনা মর্জি লে যাও। হাঁপ ছেড়ে বাঁচলো প্রবীর। জিনিসগুলো এনে দিয়ে, পনেরটা টাকা সীতাকে দিয়ে বললো, বাকী পনেরো ষোল তারিখে।

সীতা বললো, বিশ্বাস হচ্ছে না, বুঝি। দেখো এর থেকেই ছু-তিন টাকা বাঁচাবো আমি।

প্রবীর বললো, বেশ সেটা তোমার থাকবে। মাসের দশ তারিখেই কিন্তু ফুরিয়ে গেল সীতার পনের টাকা। উশুল দিল বাবার দেওয়া নিজের টাকা থেকে। মাসের শেষ তারিখে হিসেব করে দেখলো, দশ টাকা আরো বেরিয়ে গেছে। কিল চুরি করেও কিন্তু কিল দেখালো সীতা। প্রবীর বললো, কী করে বাঁচলো? সীতা বললো, পাঁচ টাকা ছ-আনা। খুশি হয়ে প্রবীর বললো, বেশ তাহলে সিনেমা দেখাও। সীতা হারবে না, বললো, বেশ রবিবার চলো।

পয়লা তারিখে জামাটা ছেড়ে প্রবীর মুখহাত ধুতে যেতে কি মনে করে সীতা পার্সটা খুলে ফেললো।

একশো কুড়ি টাকা মোটে! দত্ত বাবুকে দেয়নি নিশ্চয়ই, ওঁকে তো চল্লিশ দিতে হয় বলেছিল। তবে কি ধার দিয়েছে কাউকে, না শোধ দিয়েছে? সেটাই সম্ভব বরং। কিন্তু বলেনি তো কিছু।

পার্স টা আস্তে আস্তে তুলে রাখলো সীতা। তবে কি দুজনেই দুজনের সঙ্গে লুকোচুরি খেলছে? সীতা জোড়া দিচ্ছে জমানো টাকা থেকে, আর প্রবীর সামলাচ্ছে ধারের উপর দিয়ে?

কিছুই কিন্তু বললো না সীতা, শুধু ভেবে নিল কাল থেকে আপিসের টিফিনটা তৈরি করে দেবে সঙ্গে। হয়তো খায়ই না কিছু।

রাত্রে প্রবীর মাসকাবারী বাজারটা আনার পর তিরিশ-টাকা হাতে দিয়ে বললো, কী পারবে তো ঠিক? সীতা বললো, তোমার চলবে তো? না হলে ক-টাকা কম দিতে পারো কিন্তু।

কাছে টেনে নিয়ে প্রবীর বললো, ইস্ খুব যে গিন্নীপনা হচ্ছে। সীতা বললো, নই নাকি গিন্নী?

প্রবীর বললো, না এর মধ্যেই গিন্নী নয়, বৌ।

প্রবীরের আলিঙ্গনের মধ্যে নিজেকে ছেড়ে দিয়ে সীতা ভুলে গেল এই মুহূর্তে কী ভাবছিল। বুকের মধ্যে থেকেই বললো, ইস্! ভারী ভালবাসা, কোথায় ছিল এসব, যখন চিঠি লিখে লিখে হয়রান হয়ে যেতাম? উনি এখানে আমি ওখানে।

প্রবীর বললো, এবার তো আর কেউ ছাড়াতে পারবে না আমাদের, না?

সীতা বললো, না। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে টাকার চিন্তাটা ফিরে এল। এমনি করে উশুল দিয়ে আর ধার করে কত দিন থাকা যাবে এখানে।

মাস তিনেক পরে প্রবীরের মুদী দোকানের জিনিস আনার রহস্যটা পরিষ্কার হয়ে গেল সীতার কাছে, দোকানদারটার সঙ্গে চেনা হয়ে গিয়েছিল সীতারও। লোদী গার্ডেনে বেড়াতে যাবার পথে প্রায়ই তো নমস্কার করে প্রবীরকে।

হিসেবের ঘি-টা ফুরিয়ে গিয়েছিল সে দিন, ক-জনকে লুচি দিতে

গিয়ে। সীতা নিজেই গিয়েছিল ঘি আনতে। আপিসের পর শুকনো রুটি জলখাবার দিতে কিছুতেই মন সরে না। প্রবীর আগে অনুযোগ করলে ধমক দিয়েছে, এর মধ্যে আমার চালালেই হল তো ? তোমাকে ওসব ভাবতে হবে না।

দোকানদার ঘি-টা মেপে দিয়ে এক টুকরো কাগজ এগিয়ে দিল। লিখ দিজিয়ে। টাকাটা দিয়ে সীতা বললো, ক্যাশই দিচ্ছি।

ধারেই তাহলে নিয়ে যায় এখান থেকে প্রবীর। তাই সে মুদীর দোকানের টাকাটা দেয় না। সীতাকে জানাতে চায় না।

সীতার লুকোচুরিটা ধরা পড়লো আরো পরে যেদিন লোদী রোডের ঘরটা ছেড়ে দেবার কথা উঠলো দত্তবাবুর স্ত্রীর অপ্রত্যাশিত চিঠিটা পাওয়ার পর। নতুন পাড়ায় যাওয়া মানেই তো নগদ কেনার ঝনঝাট। এখানে তবু সহজ হয়ে এসেছিল ব্যবস্থাটা। জমা নোট কটা ফুরিয়ে যেতে সীতাও ধারে শাকসবজি রাখা শুরু করলো, খরচ কমিয়ে উশুল দেওয়াটা বন্ধ করেছিল, আরো একটু হিসেব করে মুদীর বিলটা কমিয়েছিল সাত-আট টাকা। চলে যাচ্ছিল কোন রকমে। আলোচনা করেনি কোন দিন দুজনে, তবে দুজনেই বুঝতে পেরেছিল, খরচ কমানো হচ্ছে।

মুখচূন করে বসেছিল সীতা। প্রবীর বললো, শুনেছো।

সীতা বললো, শুনলাম তো। কী করবে ?

প্রবীর চিন্তিত মুখে বললো, ঘর অবশ্য একটা পাওয়া যায় টেগোর রোডে, ভাড়াও মোটামুটি কম এখান থেকে, কিন্তু— ।

ঃ কী কিন্তু ?

ওখানে ভাড়াটা অ্যাডভান্স দিতে হবে, তারপর···সীতা ম্লান হেসে বললো, আমি জানি, প্রথম মাসে গিয়েই তো ধার পাওয়া যাবে না।

চমকে উঠে দৃষ্টিটা নামিয়ে দিল প্রবীর।—কী করে জানলে ?

ঃ জানি আমি। আমিও তো এই করছি। প্রথম প্রথম বাবার দেওয়া টাকা থেকে উশুল দিতাম, তারপর আমার টাকাও ফুরিয়ে গেছে, মাছ সবজি তো ধারেই রাখছি।

সীতার দৃষ্টি ম্লান হয়ে এল

প্রবীর বললো, আমিও তাই ধারণা করেছিলাম। এখানে দত্তর টাকাটা দিয়ে আবার ওখানে—

সীতা বললো, ভেবে আর কী করবে। আমি বলছি কি, আমি বরং চলেই যাই আবার কলকাতায়। তোমার মাইনে বাড়লে, আবার আসবো। সামনের বছরই তো।

প্রবীর বললো, পে ফিক্‌শেশনটা হয়ে গেলে তো কোন ভাবনাই ছিল না, অনেকগুলো টাকা পেতাম। ধারধোরগুলো—।

সীতা শুধোলো, কত টাকা ধার হয়েছে তোমার, তাহলে ?

প্রবীর বললো, শ-তিনেক হবে, প্রত্যেক মাসেই জের টানছি, একশো সত্তর টাকায় সত্যি কুলোয় না।

সীতা বললো, দুশো পঁচিশ পেতে না তুমি ?

প্রবীর বললো, পেতাম। ইউ, পি, এস সির পরীক্ষাটা তো দিতে পারিনি সেবার অসুখে পড়ে, আপার ডিভিশনে রাখলো না।

ঃ সে কি, এতদিন তো বলোনি কিছু। ছি ছি কেন এলাম আমি এমন করে। না হয় আরো কিছুদিন থাকতাম বাবার কাছে।

প্রবীর বললো, কিন্তু তোমাকে ছেড়ে যে আর থাকতে পারছিলাম না, সীতু।

প্রবীরের মাথাটা টেনে নিয়ে সীতা বললো, কবে পাবে তুমি পে ফিক্‌শেশনের টাকাটা, কত পাবে ?

ঃ দু-বছরের ওপর হল তো, কুড়ি টাকা করে হলে প্রায় ছশোর মতো।

ঃ তা হলে তোমার মাইনে হবে একশো নব্বই ?

প্রবীর বললো, হ্যাঁ।

মনে মনে হিসেব করে সীতা বললো, ওর মধ্যে হলে আমি চালিয়ে নিতে পারবো। কবে টাকাটা পাবে ?

প্রবীর বললো, তারই তো ঠিক নেই, সরকারী ব্যাপার। এ অফিসার থেকে ও অফিসার, তারপর বিল পাশ হতে হতে, টাকা পেতে পেতে—

: আচ্ছা দেরি হলেও টাকাগুলো পাবে তো ?

: তা পাবো। তবে কবে যে পাবো ঠিক নেই।

একটু চুপ করে থেকে সীতা বললো, বলো রাগ করবে না ?

প্রবীর উঠে বসে বললো, কী বলো তো।

: তোমাকে ছেড়ে আবার কলকাতা ফিরে যেতে পারবো না আমি। কি বলবে সবাই, বরং খান তিনেক গয়না বিক্রী করে তোমার ধারগুলো শোধ করে দাও, এর মধ্যেই চালাবো আমি—

প্রবীর বললো, ছি ছি, কী বলছ তুমি সীতু।

সীতা বললো, কেন কী হয়েছে, টাকাটা পেলে কিনে দিও আবার, এখনই তো আর কলকাতা যাচ্ছি না।

: তোমাকে কিছুই দিতে পারিনি সীতু, তোমার বাবার দেওয়া জিনিসগুলো এর মধ্যেই নষ্ট করে ফেলবো ?

সীতা বললো, নষ্ট কোথায়, কাজেই তো লাগছে আপদবিপদের জন্যেই তো এগুলো।

সীতা খুলতে যাচ্ছিলো, প্রবীর শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললো, আজ, আজ থাক না।

: বেশ কাল নিয়ে যেও কিন্তু।

অনেক দ্বিধা সংকোচের পর দোকানগুলো একটার পর একটা দেখতে দেখতে শেষ পর্যন্ত, রাত্রি আটটার সময় ন্যাশনাল জুয়েলারীর দোকানটা খালি হয়ে গেলে চুপি চুপি চোরের মতো ঢুকলো প্রবীর। মুখের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ফেলে দেখলো লোকটি। প্রবীরের চোখে মুখে অপরাধের ছাপ ছিল কিনা কে জানে, বললো, রসিদ আছে ?

: না তো।

: কোন্ দোকানে করিয়েছিলেন ?

: কলকাতায়।

ঃ রসিদ ছাড়া তো আমরা কিনি না, স্যার।

আরো দু-একটা দোকান ঘুরে একই জবাব পেল প্রবীর। রাত ন'টার পর বাসের জন্য অপেক্ষা করতে করতে যখন দশটা বেজে গেল, তখন একটা মোটর রিক্‌শাতেই চড়ে বসলো। সীতা নিশ্চয়ই ভাবছে খুব।

মুখের দিকে তাকিয়ে আতঙ্কিত হয়ে সীতা বললো, এত দেরী যে। কী হয়েছে, একি চেহারা হয়েছে তোমার, চুরি হয়ে গেছে ?

প্রবীর বললো, না চুরি হয়নি। বিক্রী হল না, রসিদ ছাড়া কেনে না কেউ এখানে।

সীতা হাঁপ ছেড়ে বললো, যাক্ আছে তো। এ আবার এক রকম দেশ। কেন তুমি কি চুরি করা জিনিস বিক্রী করছো।

প্রবীর বললো, ওরা কী করে জানবে কে চোর, কে নয়। সত্যিই এমনভাবে তাকায়, মনে হয় যেন সত্যিই চুরি করেছি।

একটা সিগারেট ধরিয়ে প্রবীর বললো, যাক্‌গে ভালোই হল, বিক্রী হল না।

সীতা বললো, কী করবে তারপর ? সে হবে না, আমার কাছে বোধ হয় স্যাকরার বিলটা আছে। কাল খুঁজে দেবো তোমাকে। এসব ধার-ফার আমার কিন্তু ভালো লাগে না, বাপু।

পরদিন টাকাগুলো সীতার হাতে তুলে দিয়ে প্রবীর বললো, বাবা, নিজের জিনিস বিক্রী করা যে এত ঝঞ্ঝাট কে জানতো। এসব বাংলা লেখা আবার পড়তে পারে না তারা। বহুকষ্টে একটা দোকানে একটু চেনা বেরুতে তবে বিক্রী হল। মাথা কাটা যাচ্ছিল আমার। টাকাগুলো গুণে নিয়ে সীতা বললো, এত কম হল ?

ঃ দেবার সময় তো কম দেবেই।

আর দেখো, এদিকে ফেরো তো। একজোড়া দুল বার করলো প্রবীর। সীতা বললো, ও এর মধ্যে আবার কেনাও হয়েছে। তাই তো ভাবছি। কেন কিনতে গেলে ওসব, দুলের কি অভাব আছে ?

সুরটা অনুযোগের। চোখে মুখে কিন্তু তৃপ্তির হাসি সীতার। খুশি হয়েছে সে।

প্রবীর কাছে টেনে নিয়ে বলল, একেবারে শুধু বিক্রীই করে আসবো ? আর প্যাটার্ন-টা খুব ভালো লাগলো আমার। পছন্দ হয়নি তোমার ?

খু—উ—ব।

প্রবীর বললো, এর পর থেকে তোমাকে সব টাকা এনে দেবো, তুমি হিসেব করে চালাবে।

সীতা বললো, ঠিক তো ?

ঃ ঠিক।

একটু পরে প্রবীর বললো, ধার শোধ দিয়েও তো পঞ্চাশ ষাট টাকা থাকবে। চলো, এবার আগ্রাটা ঘুরে আসি।

সীতা বললো, ওই, টাকা হাতে পেতে না পেতেই অমনি খরচ করার প্ল্যান হচ্ছে।

প্রবীর বললো, বাঃ এর পর হাতে টাকা থাকবে না। কখন হবে, না হবে। তুমি তো এসে থেকেই বলছো।

সীতা বললো, না, আর বলবো না। অত বিলাসিতা আমাদের পোষায় না। যখন টাকা পাবো তখন হবে। আবার কখনো হঠাৎ দরকার টরকার হলে বিদেশে কোথায় যাবে ধার করতে ? হাতে কিছু থাকা ভালো।

উচ্ছল সীতা এই ক-মাসে হঠাৎ গৃহিণী হয়ে বসেছে। অবাক-খুশি হবার সঙ্গে সঙ্গে একটু হয়তো বেদনা বোধ করলো প্রবীর।

স্নেহনীড়

উৎসবোচ্ছল স্নেহ-নীড়েও শ্রান্তি নামলো একসময়। কন্যাযাত্রীদের পর বাড়ির লোকদের খাওয়া চুকতে ছুটো, তারপর মেয়েরা গেছে বাসরের সুরভি-সন্ধানে আর এদিকে চলেছে অকারণ আড্ডা। হঠাৎ কার নজর গেছে দেয়ালঘড়িটির দিকে,—ঈস্ রাত যে ফুরিয়ে গেল, কাল আবার কুশণ্ডিকা, কন্যাবিদায় আছে। পঞ্চাশ জোড়া হাতে মাছুর সতরঞ্জি পড়েছে এখানে ওখানে, সিঁড়ির কোণে। যে যেখানে পেরেছে ছড়িয়ে ছিটিয়ে ঠেলাঠেলি করে জায়গা করে নিয়েছে।

ঘুম নেমেছে এস্ত পায়ে, অবসাদের ক্লান্তি নিয়ে।

যাদের জাগার কথা সকাল পর্যন্ত তাদের উৎসাহেও ভাটা পড়েছে তিনটা নাগাদ। হাই তুলতে তুলতে একে একে পালিয়ে এসেছে বীণা, রীণা, গীতা রুমীর দল। আর তারো ঘণ্টাখানেক পরে শেষ হয়েছে বেলা অনিলের ফিসফিসানি। বাসর ঘরেও ক্লান্তি নেমেছে।

ঘুম নেই শুধু স্নেহলতার যাঁর নামে স্নেহনীড় উৎসর্গ করা হয়েছিল পাঁচ বছর আগে। আর নেই অমরনাথের যিনি কনিষ্ঠ কন্যাকে পাত্রস্থ করে সংসারের শেষ কর্তব্যটুকু সম্পন্ন করলেন।

সারা বাড়িটা নিঝুম হয়ে যাওয়ার পরও স্নেহলতা একবার ঘুরে ঘুরে দেখলেন কে কোথায় ঘুমিয়েছে, ভাঁড়ার ঘরে আর কলতলায় বাসনপত্রগুলির হিসাব নিলেন, তারপর মনে পড়লো স্বামীর কথা। এখানে নেই, নীচে কোথাও নেই তিনি। সিঁড়ি ভেঙে উপরে উঠলেন ভারী ভারী শ্লথ পায়ে।

ছাদের কাছাকাছি আসতে সাড়া এলো, কে?

মৃদু গলায় স্নেহলতা বললেন, আমি।

ও, শোওনি এখনো।

জবাব দিলেন না স্নেহলতা, হাসলেন শুধু অন্ধকারে। তারপর কাছে এসে বসলেন, তুমিও শোওনি তো।

অমরনাথও হাসলেন, বিষণ্ণ করুণভাবে, না ঘুম আসছে না।

কেন আসছে না সে কথা অজানা নয় স্নেহলতার। বেলার বিয়ে হয়ে যাওয়ার বেদনা নয়, আরো তুই মেয়ের বিয়ে দিয়েছেন তাঁরা, ঘরেও এনেছেন তুটি মেয়ে। সে জন্যে নয়, কাল না হয় পরশু, আবার ফিরে যেতে হবে তাঁদের সেই ম্যালেরিয়া-জর্জর নিস্তব্ধ ভাঙা বাড়িতে, এবার হয়তো বাকী জীবনটুকু সেখানেই কাটিয়ে দিতে হবে। স্তব্ধ নিঝুম তারা-টিপ আকাশের নীচে ষাটোত্তর তুটি মানুষ বসে রইলেন পাশাপাশি। একজন এ বাড়ির কর্ত্তা, অপরজন স্নেহলতা, স্নেহনীড়ের গৃহিণী। অমরনাথ আর স্নেহলতা, এই বাড়ির পিছনে যাঁরা বঞ্চনাময় তিরিশটি বছর ঢেলে দিয়েছেন শেষ জীবনের স্বাচ্ছন্দ্যের আশায়। বাড়ি উঠেছে শেষসঞ্চয় কুড়িয়ে, স্নেহলতার অলঙ্কার ভেঙে, কিন্তু সে বাড়িতে, স্নেহলতার স্নেহনীড়ে, স্থান মিললো না স্নেহলতার। জোর করে কেউ তাড়ায়নি তাঁদের, ছেলে-বৌরা কেউ অসম্মান করেননি মা-বাবার। উঠে যেতে হয়েছে তাঁদের নিজেদেরই ছেলে-মেয়েদের স্বাচ্ছন্দ্যের দিকে তাকিয়ে। কটি বছরই বা বাকী আর জীবনের, তুই বুড়ো-বুড়ীর জন্য এতগুলি মানুষের অসুবিধা করতে মন চায়নি।

বুড়ো-বুড়ী? তুজনের মনে একই সঙ্গে কথাটা উঠলো। তুজনেই হাসলেন; করুণ বিষণ্ণ সলজ্জ হাসি। মনে পড়লো এই পাঁচ বছর আগে গৃহপ্রবেশের রাত্রিটির কথা।

ফ্লাওয়ার ভাসের ঝিমিয়ে আসা ফুলগুলো দিয়ে খেয়ালের বশে মালা গেঁথেছিলেন অমরনাথ, স্নেহলতা পরেছিলেন বিয়ের পুরোনো বেনারসীখানা। কী কী কথা হয়েছিল স্পষ্ট মনে আছে: স্নেহলতা বলেছিলেন, অমন করে তাকিও না বাপু এই বয়সে।

লজ্জা করে ?
করে না ? ছেলেমেয়েরা বড় হয়নি ?
ছেলেমেয়েরা বড় হলেই কি মা বুড়ী হয় ? চুপি চুপি বলেছিলেন অমরনাথ। খুশি হওনি তুমি, তোমার নামে বাড়ি হল বলে ?
কৃত্রিম লজ্জায় খুশিখুশি স্নেহলতা বলেছিলেন, ছেলেমেয়েরা কী ভাবছে বলো তো ? হাসছে না মনে মনে মা-বাবার প্রেম দেখে ?
সে রাত্রিও জেগেছিলেন দুজনে। কিন্তু আজকের মতো এমনি অন্ধকার ছাদের বিষণ্ণ নির্জ্জনতায় নয়, সেদিন প্রায় আজকের মতই সাজানো ছিল ঘরটা যেখানে বেলার বাসর হয়েছে।

রিটায়ার করে অমরনাথ চেকখানা নিয়ে বাড়ি ফিরলেন ট্যাক্সি ক'রে। তারপর জায়গা পছন্দ হল এখানে। টাকার হিসেব দিয়ে প্ল্যান নিয়ে এলেন, স্নেহলতার অনুমোদনের জন্যে, সব কথাই মনে পড়ছে এখন।
সাঁথির কথা শুনে নাক সিঁটকেছিল প্রথমে সবাই। এই বেলাই বলেছিল, সাঁথি ? আর জায়গা পেলে না তোমরা, মা ? দেখিনি, আবার। জঙ্গুলে জায়গা, পাড়াগাঁয়ের মত মোশার ডিপো, নমিতাদিদের তো বাড়ি ওখানে।
খুশি হয়েছিল শুধু সরোজ, গাছ পালার সখ তার, শ্যামবাজারের এঁদোগলির অন্ধকার ফালি উঠোনে জায়গা কোথায় যে বাগান করবে !
সত্যি ! এখনো যেন গায়ে কাঁটা দেয় পুরনো বাসাবাড়িগুলোর কথা মনে পড়লে। বিয়ে হয়েছিল মাসীমার ছিটেবেড়ার একখানি ঘরে। স্যাঁৎসেঁতে মাটির দেওয়াল বেয়ে ভাপসা গন্ধ উঠছিল সালকের খোলা নর্দমার। টিনের চালে বৃষ্টির রিমঝিম গান গায়নি বাসররাতেও, টস্ টস্ করে নোংরা জল পড়ে ভিজিয়ে দিচ্ছিল নতুন বিছানা।

তারপর পার্টিশন ঘেরা একখানা এঁদো ঘর। ওপাশের মত্ত প্রতিবেশীর আস্ফালন শোনা যেত রাত দেড়টায়, আর দিনের বেলায় জল নিয়ে বচসা। তারো পরে শ্যামবাজারের বাসায় যখন উঠে এসেছেন অমরনাথের মাইনে বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে, তখন ছেলেমেয়েরা বড়ো হতে শুরু করেছে, তিনখানা ঘরে দেয়াল থেকে দেয়াল পর্যন্ত বিছানা বিছিয়ে শুতে হয়েছে গাদাগাদি করে।

এ বাসায় আসার পরে প্রথম প্রথম কী হৈ হৈ হয়েছিল। কে কোথায় শোবে, কার কোন ঘরটা চাই, তাই নিয়ে। চাকরি করে নরেন, বড় ছেলে। সে বললো আমার কিন্তু আলাদা ঘর মা, মনে থাকে যেন। সবচেয়ে ছোটটাই দিও, কিন্তু আমার ঘরে অন্য কেউ থাকতে পারবে না। মেজ কমলের গানবাজনার সখ, কিন্তু দাবি তার কম, পড়ছে তখনো। সে বললে, আমাকে বরং বাইরের বারান্দাটা ঘিরে দাও কাঠ দিয়ে, বাইরের ঘরও হবে তোমাদের। মিস্ত্রী খাটছে তখনো। যুক্তিটা মন্দ লাগলো না স্নেহলতার, তাই হল। কিন্তু তাহলেই কি জায়গা কুলোয়, গোটা বড় ঘরটা স্নেহলতার নিজের জন্যে রাখলে? সেখানে বেলাও থাকবে বৈকি।

মাসদুয়েক পরে ভবতোষ এসে ঘুরে গেল আর একবার, বীণা গেল না। বললো, কিছুদিন থাকি মা এখানে, এবারে তো নিজের বাড়ি তোমার। সেই বিয়ে হয়ে শ্বশুরবাড়ি গেছি, মাস খানেকও কখনো থাকিনি একসঙ্গে। খারাপ দেখায় না, কী বলো?

মাস তিনেক কাটিয়ে বীণা যদি গেল তো এসে পড়লো রীণা। বিয়ে হয়ে অবধি বাসার অভাবে পড়ে আছে পাড়াগাঁয়ে, ম্যালেরিয়ায় ভুগে চেহারা হয়েছে হাড্ডিসার। ফিরে গিয়েছিল গৃহ প্রবেশের দিন চারেক পরে শাশুড়ীর অসুখের খবর পেয়ে। এসে বললো, রোগটা এবার তাড়িয়ে যাবো, মা।

স্নেহলতা বললেন, বেশ তো থাক্ না ক'দিন। শরীর সারলো আস্তে আস্তে। কিন্তু যাবার কোন লক্ষণ দেখা গেল না। অপরেশ

আসতো প্রথম প্রথম ছুটিছাটার দিনে। ক্রমে তার আসাটাও কমে এলো। হটাৎ মাসদুয়েক পরে যাতায়াতটা আবার বেড়ে গেল তার, কিন্তু হাজার বললেও রাত্রে থাকবে না কোনদিন।

কিছুদিন পরে রীণা বললে, মা একটা কথা বলবো?

স্নেহলতা বললেন, আজো স্পষ্ট মনে আছে, বল্ না কি বলবি। অত কিন্তু কিন্তু করছিস কেন! চলে যাবি?

রীণা বললো, চলে যেতেই তো বলছে ও, কিন্তু ভয় করছে মা। আবার সেই ম্যালেরিয়ার খপ্পরে গিয়ে—

কথাটা অসমাপ্ত রেখে মায়ের চুলগুলো হঠাৎ বাছতে শুরু করে দিয়েছিল রীণা, সব যে সাদা হয়ে গেল মা।

হাসলেন স্নেহলতা। বয়স কি কম হল রে।

ঈস, কেউ বলুক তো দেখি তোমার বয়স কতো ঠিক করে, শুধু চুলই যা দু-একটা পাকছে।

কথাটা সত্যি। তার মাস ছয়েক আগেই তো গৃহ-প্রবেশের দিনটিতে আয়নায় তাকিয়ে তাকিয়ে দেখেছিলেন স্নেহলতা।

সে কথাটা উড়িয়ে দিয়ে বলেছিলেন, হ্যাঁ, কী বলছিলি তুই?

আঙুলে আঁচল জড়িয়ে মুখ নীচু করে বলেছিল রীণা, ···বলছিলাম একখানা ঘর দাও না আমাদের।

ঘুরে বসে মেয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে হাসলেন আবার স্নেহলতা, ও, এই কথা? বেশ তো থাকতে বললেই তো পারিস যে ক-দিন আছিস তুই। আমিও তো তাই বলছি, যে লাজুক ছেলে অপরেশ। থাকুক না কিছুদিন এখানে।

রীণা একবার মায়ের চোখের দিকে তাকিয়ে নিল আড়চোখে, তারপর বললো, তা নয় মা। সে ও থাকবে না কিছুতেই। বলছিলাম আমাদের একখানা ঘর তুমি ভাড়া দাও মা তোমারও কিছুটা সাশ্রয় হয়, আমাদেরও—

স্তম্ভিত স্নেহলতা বলেছিলেন,—তোর কি মাথাখারাপ হয়েছে খুকী ! ঘর ভাড়া দেব তোকে !

রীণা এবার হাতদুটো জড়িয়ে ধরলো মায়ের ।—না মা আপত্তি কোরো না তুমি আবার যদি গাঁয়ে ফিরে যেতে হয় মা, ঠিক বলছি এবার আর দেখতে পাবে না আমাকে ।

স্নেহলতা বললেন, ছিঃ খুকী নিজে মা হয়েছিস জানিস না মাকে ওসব কথা বলতে নেই ? থাকবি থাক্, ভালো কথাই তো, কোন্ মা না চায় মেয়ে তার কাছেই থাকুক । কিন্তু ভাড়ার কথা তুলিস না, মা ।

রীণা বললো;—না মা, থাকবো যখন ভাড়াও দেব আমরা নইলে জামাই তোমার কিছুতেই রাজী হবে না, জানো তো ওকে । তোমার দুটি পায়ে পড়ি মা—আপত্তি কোরো না ।

স্নেহলতা বললেন, কী জানি মা । আমি তা পারবো না । তোর ভাইরা শুনলে কি বলবে ভেবে দেখেছিস—একে তো শোওয়ার ব্যাপার নিয়ে কী ঝগড়া—কেমন করে যেন বেরিয়ে গিয়েছিল কথাটা মুখ দিয়ে । রীণার রাগ দেখে মনে হল, বলাটা উচিত হয়নি ।

রীণা বললো, ওঃ বুঝেছি । আমার জন্যে তোমাদের অসুবিধে হচ্ছে । এতদিন বলোনি কেন মা ? আজ রাত্রের ট্রেনেই চলে যাচ্ছি ।

সত্যি সত্যিই উঠে যাচ্ছিল রীণা, জোর করে বসালেন স্নেহলতা । শোন খুকী, সে-কথা বলিনি আমি ।

বলোনি ? বললে এইমাত্র ।

শেষ পর্যন্ত কমল এসে ঠাণ্ডা করেছিল রীণাকে । সেই থেকে রইলো ওরা । স্নেহনীড়ের তিনখানা ঘরের মধ্যে স্নেহলতার রইলো দুখানা । ঘেরা বারান্দা ধরলে অবশ্য তিনখানা কিন্তু তাই বা রইলো কোথায় । বছর না ঘুরতে কমল নরেনের বিয়ে দিয়ে বিদায় নিতে হল স্নেহলতাকে । ব্যাপারটা একটু অস্বাভাবিক ভাবেই ঘটে গেল ।

হঠাৎ একদিন সন্ধ্যাবেলায়, চাকরি পাওয়ার ঠিক মাস দুয়েক পরে, দেখা গেল কমলের আর গানে মন বসছে না, এদিক ওদিক ঘুরে ঘুরে

একা খোঁজে মা-কে। শেষ পর্যন্ত রীণার সামনেই বলে বসলো, তোমরা কি ভেবেছ মা বলো দিকি। দাদার বিয়ে টিয়ে দেবে না?

স্নেহলতা বললেন, দেব না কেন? দেখা না তোরা একটা ভালো মেয়ে। তারপর কমলের সলজ্জ অপ্রতিভ মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন, ব্যাপার কি বল্‌তো। হঠাৎ যে তোর দাদার ওপর এতো দরদ?

পাশে বসে রীণা দুধ খাওয়াচ্ছিল মেয়েকে, চোখমুখ মুছিয়ে তাকে নামিয়ে দিয়ে বললো, আমি জানি মা, মেজদার তাড়া কিসের।

ইঙ্গিতটা না বুঝলেন তা নয়, তবু ভালো করে জানার জন্যে স্নেহলতা বললেন, কী বল্‌তো।

মেয়ের মুখে আর একটু পাউডার বুলিয়ে দিয়ে রীণা বললো, ডুবে ডুবে জল খাচ্ছে দাদা।

কমল কী বলতে যাচ্ছিল প্রতিবাদে, রীণা বললো, থামো থামো, খুব হয়েছে। তুমি বরং যাও, আমিই বলছি মাকে।

সত্যি সত্যই উঠে গেল কমল। রীণা বললো, রেখাকে তো দেখেছ তুমি। সে-ই।

কী বলেছিলেন স্নেহলতা এখন আর মনে নেই ঠিক। তবে তার মাস ছয়েকের মধ্যেই নরেনের বিয়ের ব্যবস্থা করেছিলেন, নিজের ঘরখানা ছেড়ে দিয়ে।

ঘর তোলার প্রশ্ন উঠতে প্রথমে অমরনাথ বলেছিলেন আরো বছর দুয়েক যাক্ না, সরোজের একটা চাকরি বাকরি হোক্। ঘর তো আর একখানা তুলতেই হবে। তুলেও ছিলেন স্নেহলতা শেষ পর্যন্ত নিজের কিছু গহনা বিক্রি করে? আর ইনসিওরেন্স পলিসি থেকে ধার নিয়ে। কিন্তু তাতেই কি সমস্যা মিটলো? যাবো যাবো করেও যেতে পারেনি রীণা। দুশো টাকা মাইনে অপরেশের, ঘর ভাড়ায় যদি পঞ্চাশ টাকা বেরিয়ে যায় তো খাবে কি আর পাঠাবেই বা কি বুড়ো বাবা-মাকে? বাড়তি ঘরে জায়গা দিতে হল কমলের বৌ-কে।

কমলের বিয়ের কথা শুনে প্রথমে অমরনাথ আশ্চর্য হয়ে বলেছিলেন, এখুনি ? এই তো এক বছর হয়নি নরেনের বিয়ে হল, বেলার বিয়ে হোক্ আগে। তাছাড়া কতই বা বয়স হল ওর ?

স্নেহলতা হেসে বলেছিলেন ওর বয়সে তোমার নরেন, কমল, বীণা, তিন ছেলে মেয়ে হয়েছিল মনে নেই ? সে জন্যে নয়, আজকাল একটু দেরিতেই বিয়ে হল। কিন্তু সাহস হয় না আমার চারদিক দেখে শুনে।

রেখার কথাটা বলতে হয়েছিল সেদিন খুলে। মা-বাপ মরা মেয়ে, মামার কাছে মানুষ। অপছন্দ নয় রেখাকে, কিন্তু প্রশ্ন তো শুধু ঘরেরই নয়। কমল আর নরেনের আয়ে কি আর একজন বৌ-এর ভার নেওয়া চলে ?

মা আর বাবা। চিন্তা করতেও লজ্জা এধরণের সমস্যাগুলি। স্বামী আর স্ত্রী পরম আপন। তবু মনে মনেই রইলো কথাগুলি।

কিন্তু রীণার কথাগুলিও তো অগ্রাহ্য করার নয়। রীণার অর্থাৎ কমলের। রেখার মামা বিয়ের জোগাড় করছে পঁয়তাল্লিশ বছরের বিপত্নীক ব্যবসায়ীর সঙ্গে, তাড়াতাড়ি ব্যবস্থা না করলে রেখা বলেছে বিষ খাবে। আর কমলের মতিগতি তো স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে। রীণাকে বলেছে বাবা-মা না করলে রেজিষ্ট্রি করে সমস্যার সমাধান করবে সে শেষ পর্যন্ত।

কিছুদিন পরে স্নেহলতাই প্রস্তাব তুলেছিলেন, একটা উপায় আছে।

কী ?

তুমি আর আমি যদি গ্রামে গিয়ে থাকি।

গ্রামে ? কী বলছ তুমি ? পারবে তুমি এই বয়সে ? রীণা পালিয়ে এলো ম্যালেরিয়ার ভয়ে।

স্নেহলতা বলেছিলেন,এ ছাড়া আর উপায় কি বলো ? শেষ পর্যন্ত যদি সত্যিই রেজিষ্ট্রি করে বসে, কী গোলমাল বলো তো, ঘরে তো নিতেই হবে বৌ-কে। তখন ? তার চেয়ে মেনে নেওয়াই ভালো।

তারপর হঠাৎ জোর করে ফোটানো উৎসাহ দেখিয়ে বলেছিলেন, ভালোই তো। জমি রয়েছে, বাড়ি রয়েছে ওখানে। ভাড়া তো আর দিতে হবে না, বরং দেখে শুনে নিলে আমাদের ত্বজনের জমির ধানেই চলে যাবে মোটামুটি, তুমিই তো বলেছ। জমির ধান, শাক তরকারী পুকুরের মাছ আমার তো বরং ভালোই লাগবে। ছেলে মেয়েরাও যাবে মাঝে মাঝে, টাটকা জিনিসপত্র পাবে। এখানে তো সবই কিনতে হয়। অথচ গ্রাম থেকে বছরে ৭০৲।৮০৲ টাকা পাও কি পাও না। তারপর, বেশ তো, স্নেহলতা বুঝিয়ে বলেছিলেন স্বামীকে, ভালো না লাগে চলে আসবো আবার ত্ব-তিন বছর পরে। সরোজ চাকরি করবে তখন। আর ইনসিওরেন্সের টাকাটাও তো পাওয়া যাবে ততদিনে। না হয় আর একখানা ঘর তুলে নেওয়া যাবে।

প্রথম প্রথম মন্দ লাগেনি গ্রামজীবনের আস্বাদ। ছেলেমেয়েরা আসতো ঘন ঘন, বৌমারাও এসে থেকে গেল ত্ব-একবার। অফুরন্ত অবসর, খোলা বাতাস, সব্জীবাগান, আম কাঁঠালের মিষ্টি গন্ধ, লেবু, কুল, করমচা, সবই তাঁর নিজস্ব।

তারপর ম্যালেরিয়া ধরলো আস্তে আস্তে। ছেলেমেয়েদের উৎসাহেও ভাটা পড়লো। খরচের প্রশ্নও আছে। যাতায়াত কমে এলো ধীরে ধীরে। বছর খানেকের মধ্যেই স্নেহলতার ছোট্ট সংসার পৃথক হয়ে গেল। প্রথম ক-মাস টাকা পাঠিয়েছিল ত্ব-ছেলে। কমতে কমতে সেটাও বন্ধ হয়ে গেল এক সময়। কলকাতায় খরচ বাড়ছে আস্তে আস্তে।

ইনসিওরেন্সের টাকাটা পাওয়া গেল গত বছর। ঘরও উঠলো। একখানা নয়, ত্বখানা কিন্তু সে ত্বখানা ভাড়া দিতে হল আশি টাকায়, স্নেহলতার আশাটুকু নিভিয়ে দিয়ে। শেষ সম্বল কুড়িয়ে বাড়িয়ে বেলার বিয়ের যোগাড় করলেন। এই কটা টাকা সংসারের টানে ফুরিয়ে গেলে কী হতো তারপর ?

সানাইয়ের সুরে ঘুম ভাঙলো স্নেহলতার ধড়মড় করে উঠে বসলেন চোখ রগড়ে। ছাদের কার্ণিশে রোদ এসে পড়েছে। ছি ছি ঘুমিয়ে পড়েছিলেন এত বেলা পর্যন্ত। কী হচ্ছে কে জানে নীচে। কুশণ্ডিকার জোগাড় করতে হবে, এতগুলি লোকের চা জলখাবারের ব্যবস্থা চাই।

ত্রস্ত পায়ে নেমে এলেন স্নেহলতা। আরো একটু ঘুমুন অমরনাথ, ক-মিনিটই বা। এখুনি রোদ এসে পড়বে।

নেমে আসতে আসতে ভয় হল, হঠাৎ ছাদে শুয়ে জ্বর না এসে পড়ে। আহা, সত্যিই যদি জ্বর এসে যেতো। মনে মনে লজ্জা পেলেন স্নেহলতা। এ কি স্বার্থপর চিন্তা তাঁর! এই ভিড়ে বিয়েবাড়িতে জ্বর হলে তাঁকে নিয়ে বিব্রত থাকলে চলবে কী করে। একটু শোওয়ার জায়গা পর্যন্ত নেই। জ্বর যদি আসেই তো আরো যেন দুটো দিন দেরী করে আসে। এখানে নয়, গ্রামের বাড়িতে ফিরে যাওয়ার পর।

নীচে তখনো মায়াস্নিগ্ধ স্নেহনীড়ে সুষুপ্তির আশ্বাস। কাউকে ডাকলেন না স্নেহলতা, অবসন্ন হাতে জোর টেনে কাজে লাগলেন আবার, গত রাত্রির গ্লানিময় চিন্তাগুলিকে চাপা দিয়ে।

মহাল

সন্ধ্যার আগেই অন্ধকার ঘনিয়ে এলো। আরো জোরে পা চালালো অরুণ।

লক্ষ্মীপুরের ডাঙ্গা। ডাঙ্গা পেরিয়ে দুটো রাস্তা। একটা গেছে লক্ষ্মীপুর, আর একটা লক্ষ্মীপুরকে বাঁয়ে রেখে তে-সতীনের পাড় ঘেঁষে চলে গেছে শ্রীবাটি পর্যন্ত। শ্রীবাটির ওপাশেই নন্দীগ্রাম।

নাঃ বৃষ্টিটা যে ঠাণ্ডা হাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ছুটে আসছে শ্রীবাটির মাঠ ভেঙে। অরুণ ডাইনের রাস্তা ধরলো।

লক্ষ্মীপুর গ্রামটা ছোট হলেও বর্ধিষ্ণু। লোক বলে জাগ্রত কালীর আশীর্বাদ আছে গ্রামের ওপর। শোনা যায় বহু বছর আগে কালীপূজার রাত্রে মানুষ বলি হ'তো এখানে।

প্রণাম করতে করতে অরুণের মনে পড়লো আট বছর আগেকার কথা। ছায়াকে নিয়ে মা একবার এসেছিলেন ধুনো পোড়াতে। ধুনো পোড়ানো একটা বিশেষ অনুষ্ঠান। পাঁঠা বলির ঠিক আগে, ধুনোর সরা মাথায় সারি দিয়ে বসবে বন্ধ্যা বউ আর রুগ্ন ছেলেদের মায়েরা। মন্ত্র পড়বেন বৃদ্ধ তারিণী ভট্চাজ, একসঙ্গে ধুনো পড়বে একশোটা সরায়। দপ্ করে জ্বলে উঠবে সুগন্ধ আগুনের শিখা। একশোটা ঢাক বাজবে একসঙ্গে। ছেলেমেয়েরা অবাক-বিস্ময়ে দেখবে আগুনের উৎসব।

অন্ধকারে দেখা যায় না, তবু অরুণ হাত বুলিয়ে দেখলো নতুন মার্বেল পাথরের বেদী। পুলিন চক্রবর্তী বড় ব্যবসায় লক্ষপতি হয়ে বাঁধিয়ে দিয়েছেন মায়ের স্থান। এইসঙ্গে যদি একটা মণ্ডপ করে দিতেন! —না, তার উপায় ছিল না। রোদ বৃষ্টি উন্মুক্ত আকাশই পছন্দ করেন মা।

কিন্তু এখন কোথায় দাঁড়াবে সে, কার বাড়ী আশ্রয় নেবে ?
সুটকেশটা ইতিমধ্যে ভিজে গেছে। ভিতরে কাপড়-চোপড়ের কী অবস্থা কে জানে ?
অজানা অচেনা কার বাড়ী গিয়ে উঠবে ? তার চেয়ে শিবমন্দিরের ভাঙা চালাটার নীচে অপেক্ষা করাই ভালো।
সুটকেশটা নামিয়ে মাথাটা মুছে নিলো অরুণ। বেশ শীত শীত করছে এবার। হাতড়ে হাতড়ে সুটকেশটা খুললো। নাঃ কাপড় জামা সব ভিজে গেছে, বের করতে গিয়ে আবার ধুলো কাদায় একাকার হয়ে যাবে।
অন্ধকারে ভিজতে ভিজতে একসময় আলোর রেখা দেখে আশান্বিত হলো অরুণ।
টর্চ-লাইট ফেলে ফেলে কে যেন আসছে। নিশ্চয়ই কোন বৃদ্ধ লোক, পা টিপে টিপে চলেছে।
কাছে আসতে বোঝা গেল বৃদ্ধ নয়, তারই বয়সী একটি ছেলে। প্রণাম করে শিবঘরের দিকে এগিয়ে আসতেই নজরে পড়ল অরুণকে।
—ওখানে কে ?
—আমি ট্রেনের যাত্রী। নন্দীগ্রামে যাবো।
ছেলেটি উঠে এলো চালার মধ্যে।—অরুণের দিকে তাকিয়ে বললো, আপনি যে একেবারে ভিজে গেছেন দেখছি। এখানে দাঁড়িয়ে থাকলে জ্বর হয়ে যাবে যে।
অরুণ বললো এখুনি তো ছেড়ে যাবে।
—কিন্তু এখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভিজবেন, সে কি হয় ! তাছাড়া, এই রাত্তিরে আলপথ দিয়ে যাবেনই বা কেমন ক'রে। আজকের রাত্তিরটা বরং এখানে থেকে, কাল ভোরে যাবেন।
অরুণ হেসে বললো, আজ রাত্রেই ফিরতে হবে আমাকে।
বৃষ্টি থামলে তো। সে পরের কথা পরে দেখা যাবে। এখন চলুন আমাদের বাড়ী।

সুটকেশটা ইতিমধ্যে তুলে নিয়েছে, ছেলেটি। অরুণ আর আপত্তি করলো না।

নিজের পরিচয় দিয়ে ছেলেটি বললো, আমার নাম বিমল চৌধুরী। আচ্ছা নন্দীগ্রাম কি আপনার বাড়ী?

অরুণ বললো—হ্যাঁ, আমার নাম অরুণ ব্যানার্জি।

—আরে আপনাকে তো আমি চিনি। আপনি তো রিপনে পড়েন, না?

—আপনি কী ক'রে জানলেন?

—বাঃ পাশের গাঁয়ের লোক আপনি, জানবো না? আপনি না হয় বিদেশে বিদেশে কাটিয়েছেন, দেশের খোঁজখবর রাখেন না। আমরা তো আজন্ম এদেশেই মানুষ। দেখুন দেখি আপনি কিনা এখানে দাঁড়িয়ে ভিজছিলেন।

বিমল বাড়ী ঢুকেই চেঁচিয়ে উঠলো।—মা দেখে যাও কাকে এনেছি।

বিমলের মা সব কথা শুনতে পাননি, বললেন, আয় না এখানে। আমি তরকারী চাপিয়েছি, পুড়ে যাবে যে।

বিমল এবার রান্নাঘরেই ঢুকে পড়লো অরুণকে নিয়ে। এই দেখো, আমার বন্ধু অরুণবাবু। অরুণ প্রণাম করতে বিমলের মা নতুন লোকের সামনে ভীষণ লজ্জা পেয়ে ব্যস্ত হয়ে উঠলেন ঘোমটা দিতে গিয়ে। হোক্ না ছেলের বয়সী, অপরিচিত তো।

—থাক, থাক, চলো বাবা। ইস, কাপড়-জামা যে ভিজে শপ্ শপ্ করছে। তোর কী বুদ্ধি বিমু, আগে কাপড়-জামা দিতে হয়, অসুখ করবে যে।

—উনি তো বলেন কিচ্ছু হবে না। শিব-তলায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভিজছিলেন। আমি জোর করে ধরে নিয়ে এলাম।

—বেশ করেছিস্ এনে। কাপড়-জামা ছাড়তে দে আগে। হ্যাঁ, বাবা এমন করে কেউ ভেজে? যদি অসুখ-বিসুখ হয়?

চা খেতে খেতে বিমল বলে, জানেন অরুণবাবু, মা আমার গাঁয়ের বন্ধুদের সামনেও ঘোমটা দেয়।—

হাসলেন বিমলের মা। কথাটা অবশ্য মিথ্যে নয়। পনের বছর বয়সে বিয়ে হয়েছিল। তারপর থেকে এই বাড়ীর চৌকাঠ কদিন পার হয়েছেন গুনে বলে দিতে পারেন এখনো। কালীপূজা ছাড়া, বিশেষ নিমন্ত্রণেও বাইরে যাবার হুকুম ছিল না তাঁর।

বিমলের বাবা নারায়ণ চটুজ্যের বিয়ে হয়েছিল ছাব্বিশ বছর বয়সে। গরীব ঘরের টুকটুকে বৌ এনেছিলেন বিমলের ঠাকুরমা, নারাণকে ঘরে বাঁধবার জন্যে। নারাণ চাটুজ্যে বাঁধা পড়েননি, বাড়ীর মধ্যে বন্দী হয়েছিলেন সাবিত্রী দেবী। তিন মাস পরেই মারা যান বিমলের ঠাকুরমা। তারপর থেকে স্বামীর কীর্তি-কাহিনী বামীর মারফৎ কানে এসেছে বৈ কি তাঁর, তাছাড়া, তিনি নিজেই কি কম অত্যাচার সহ্য করেছেন। সে-সব দিনের কথা থাক। বিমুকে পেয়ে জীবনের অর্থ খুঁজে পেয়েছেন তিনি। বিমু কতো তাড়াতাড়ি বড় হয়ে উঠলো। এইতো সেদিন বিমু এলো। বুক জুড়ে। ছেলে তো নয় আকাশের চাঁদ। না, এ তাঁর নিজের ছেলে বলে গর্ব করা নয়। গাঁয়ের লোক কী ভালোই বাসে বিমুকে। ইস্কুল, ক্লাব, সমিতির কোন ব্যাপারই বিমুকে নইলে চলে না। এমন যে দুর্দান্ত বিমুর বাবা তিনিও কেমন যেন সমীহ করেন ছেলেকে। শুধু স্নেহই নয়, গর্বও আছে, ভয়ও আছে।

গাঁয়ের লোক বলে, অর্থাৎ বামী বলে—দাদাবাবুকে ভয় করে কত্তাবাবু জানো মা। দাদাবাবু বড়ো হওয়ার পর থেকে কত্তাবাবু আর সে কত্তাবাবু নেই।

সাবিত্রী দেবী জানেন বামীর কথা মিথ্যে নয়।

চা খাওয়া শেষ হলে বিমুর মা বল্লেন, যাও এবার তোমরা ওনার সঙ্গে দেখা করে এসো।

ইতিমধ্যে অরুণের রাত্রে ফেরার প্রশ্নটা চাপা পড়ে গেছে। বৃষ্টি

থামার কোন লক্ষণ নেই। তাছাড়া বিমলের সঙ্গে গল্প করতে ভালই লাগছে।

নারাণবাবু তখন প্রজাখাতকদের দরবার শেষ করে হিসেব মিলাচ্ছিলেন এ তালুকদারীটুকু তাঁর নিজের হাতেই করা। যৌবনকালে বাবার সম্পত্তি উড়িয়ে দিয়েছিলেন মুঠো মুঠো করে। লোকে ভেবেছিল এবার পথের ভিখিরী হবে নারাণ চাটুজ্জে। তা হয়নি। বিমু আসার পর একদিন হঠাৎ খেয়াল হয়েছিল, তাইতো ছেলেকে তো বাঁচাতে হবে, মানুষ করতে হবে। এই খেয়ালের পিছনে একটা ইতিহাস আছে।

শেষ সম্পত্তিটুকু বিক্রী করে যখন টাকাটা শহরেই শেষ করে দিয়ে একমাস পরে ফিরলেন তখন বিমুর মা বলেছিলেন—ঘোষ কাল থেকে দুধ দেবে না বলছে, কি খাবে খোকা?

ক্ষেপে উঠেছিলেন তিনি—কী, দুধ দেবে না বলেছে সে বেটা? বড় বাড় বেড়েছে হারামজাদা।

রেগে বেরিয়ে গিয়ে মাথা ফাটাফাটি করেছিলেন ঘোষের সঙ্গে, কিন্তু দুধ মেলে নি। বিমু কেঁদেছিল সারারাত। তার পর থেকে মতি ফিরে গেল নারাণ চাটুজ্জের। খাস জমিগুলো দেখতে শুরু করলেন নিজে, হিসেবী হলেন, সংসারী হলেন বিমলের বাবা।

জোচ্চুরী করেছেন, অত্যাচার করেছেন, সর্বনাশ করেছেন কত লোকের। কিন্তু তালুকদারী হয়েছে। বিমুকে মানুষ করতে হবে—বিমুর যেন কোনোদিন কিছুর অভাব না হয়।

ক্রমশঃ সম্পত্তির নেশা পেয়ে বসেছে। আজকের দরবার ছিল তারই। মধুসূদন মিত্তির জলের দরে ছেড়ে দিচ্ছে কালিক্ষেতলার মহালটা। ক'দিন ধরে তাগাদা দিয়ে, ভয় দেখিয়ে, মিষ্টি কথায়, টাকা উঠেছে হাজার তিনেক। বিমুর মা-এর গহনাগুলো ধরলে পাঁচ হাজার। তবু টান পড়ছে হাজার পাঁচেকের। কোথায় পাওয়া যায় এতগুলো কাঁচা টাকা? চিন্তায় ছেদ পড়লো।

—বাবা ইনি অরুণ ব্যানার্জি। নন্দীগ্রাম যাচ্ছিলেন এই বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতে, আমি নিয়ে এলাম ডেকে। আজ থাকবেন এখানে।

অপ্রসন্ন দৃষ্টি মেলে নারাণ চাটুজ্জে তাকালেন, ও। থাক থাক, প্রণাম করতে হবে না। হ্যাঁ নাদগাঁয়ে বাড়ী তোমার, কার ছেলে?

—নিবারণ বন্দোপাধ্যায়।

—ও রেলে কাজ করতেন যিনি?—অন্য-মনস্কভাবে দায়ে পড়ে যেন কথাগুলো বললেন নারাণ চাটুজ্জে।

—হ্যাঁ, বাবা, উনি এখন রিপনে পড়ছেন—আমাদের একই ইয়ার।

—আচ্ছা যাও, মুখ হাত ধোও গিয়ে। খাতাপত্র গুলো আবার টেনে নিলো চাটুজ্জে মশাই। এই সমস্যাটা সমাধান করা দরকার।

খাবার জায়গা হলো একসঙ্গে। অরুণ, বিমল আর বিমুর বাবা। চাটুজ্জে মশাই অন্যদিন খেতে বসে গল্প করেন বিমুর সঙ্গে। কলকাতার গল্প। কলেজের গল্প, মাস্টার মশায়দের আর বন্ধুদের গল্প। কী খাওয়ায় হোস্টেলে, ঠাকুর রাঁধে কেমন? খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে শুধোন আইন আদালত কোর্টের খবর, দেশী-বিদেশী সংবাদ। চাটুজ্জে মশাই-এর এটুকু বিলাস। আজ কিন্তু চুপচাপ খেয়ে চল্লেন। কে জানে মহালের চিন্তায়, না অরুণের জন্যে।

সাবিত্রী দেবী আজ বহুকাল পরে বাইরের লোক পেয়েছেন গল্প করার জন্যে; কটি ভাই তোমরা অরুণ?

—তিন ভাই, চার বোন।

—তুমি বুঝি ছোট?

—না মাসীমা, আমি মেজ।

—বোনেদের সব বিয়ে হয়ে গেছে?

—একজন বাকী ছিল, তারই তো পরশু বিয়ে। দেখুন না, ছায়াটার জন্যেই আমার এই দুর্গতি।

হঠাৎ হেসে ফেলে অরুণ আবার বললো—প্রথমে ভীষণ রাগ হচ্ছিল ওর ওপর বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতে। ওর গয়নাগুলো আনতে গিয়েই তো আমার দেরী হয়ে গেল। ছুটি হয়ে গেছে ছ'দিন আগে। আজ দিচ্ছি, কাল দিচ্ছি করে, দিল আজ সকালে। এমন রাগ হচ্ছিল তখন, এখন ভাবছি দেরী হয়েছিল বলেই তো আপনাদের সঙ্গে আলাপ হয়ে গেল।

বিমল বল্লে, আপনার সাহস তো কম নয়। এই গয়না নিয়ে আপনি রাত্তিরে একা একা যাচ্ছিলেন। দেখুন তো বাঁচিয়ে দিলাম আপনাকে আমি।

অরুণ বল্লে, কি করি লোক এসে পৌঁছালো না। ভাবলাম কে আর জানছে আমার কাছে গয়না আছে। তবে ডেকে অবশ্য ভালই করেছেন? সত্যি, পাশাপাশি গ্রামের কিছুই তো চিনি না—সেই একবার এসেছিলাম এখানে আট বছর আগে কালী পূজার সময়।

—বেশ তো, বিয়ের পর চলে আসুন না, এদিকটা বেড়িয়ে যাবেন, আমার সঙ্গে।

হ্যাঁ, তোমাকে আর বাহাদুরি করতে হবে না, তুমি যা চেন রাস্তা, বিমুর মা বল্লেন।

সে একটা লোক সঙ্গে নিলেই হবে? কী, আসবেন তো?

—আসতে পারি, আপনি যদি আমাদের বাড়ী যান আমার সঙ্গে। চলুন না, বিয়েটা দেখে আসবেন।

বিমল যেন লাফিয়ে উঠলো—যাবো মা? মা বল্লেন, হ্যাঁ, এই বর্ষাকালে কোথা যাবি কাদায় কাদায়? কতদিন বাদে বাড়ী এলি। যাবি এখন একসময়।

তোমরা কোথাও যেতে দাও না আমাকে। বিমল রাগ করলো।

মা ইশারা করে দেখিয়ে দিলেন বাবাকে, আমি কি করবো, উনি যেতে দেবেন নাকি?

সবাই হঠাৎ দৃষ্টি ফিরিয়ে দেখলো, খাওয়া বন্ধ করে এক হাতে মাথা

চুলকোচ্ছেন বিমুর বাবা। এসব কোন কথাই বোধ হয় তাঁর কানে যাচ্ছে না। ঈস এতক্ষণ ওরা যেন ভুলে গিয়েছিল উনি পাশেই বসে আছেন।

হঠাৎ আবহাওয়াটা বদলে গেল। মুখ নীচু করে খাওয়া শেষ করলো সবাই!

চাটুজ্জে মশাই যেন সম্বিৎ ফিরে পেয়ে শুধোলেন—তোমার পেট ভরেছে তো—অরুণ? অরুণের মুখ দিয়ে একটা আওয়াজ বের হলো শুধু।

বিমল বললে, মা থাকাতে আধপেটা খাওয়ার উপায় আছে?

হাত ধুয়ে চাটুজ্জে মশায় গড়গড়াটা নিয়ে দরদালানে গিয়ে বসলেন। শোবার জায়গা করতে গিয়ে গোলমাল বাধলো। নিজের বুদ্ধি মত বাইরের ঘরে শুধু অরুণের জন্য বিছানা করেছিল বামী।

বিমল রেগে গিয়ে বললো—কে বলেছে তোকে এমন করে বিছানা করতে? যা আমার বিছানা নিয়ে আয়।

—চেঁচামেচি করো না দাদাবাবু। রোজ তুমি এখানে শোও না কি?

—বাজে বকিস্ না, যা বলছি তাই কর।

জানি না বাপু, মাকে ডাকছি আমি।

বামী গজ গজ করতে করতে চলে গেল।

গোলমাল শুনে মা নিজেই এসে হাজির, কি, হয়েছে কি?

—বাঃ, উনি বুঝি একা এই গয়নাপত্র নিয়ে বাইরে থাকবেন?

—স্যুটকেশটা নিয়ে গিয়ে ভিতরে রেখে দিই, তাহলে?

—আমরা বাপু একসঙ্গে শোব, বলে দিচ্ছি, বিমল বললো।

বিমলের মা বললেন,—ও তাই বলো, সারারাত গল্প করার মতলব তোমার। ও বেচারা সারাদিন খেটেখুটে আসছে, ঘুমুতে দে ওকে। তুই চ ভিতরে, এখানে তোর ঘুম হবে না।

শেষ পর্যন্ত বিমলের জিদই বজায় রইলো। অরুণ আর বিমলের

বিছানা বাইরের ঘরেই হলো। দেখে গেলেন একবার চাটুজ্জে মশাই, মনে মনে অসন্তুষ্ট হলেও কিছু বললেন না।

নারায়ণ চাটুজ্জ্যের চোখে আজ ঘুম আসছে না। মহালটার ব্যবস্থা আজ রাতের মধ্যেই ভেবে ঠিক করতে হবে। এ সব দাঁও-এর ব্যাপারে বেশী দেরী করতে নেই। কী জানি, অন্য কেউ যদি আবার বেশী দর হেঁকে বসে।

গড়গড়াটি আজ সারারাতই জ্বলবে। সাবিত্রী দেবী তামাকের ব্যবস্থা করে দিয়ে শুয়ে পড়েছেন।

মাঝ রাত্তিরের পর ভাবতে ভাবতে মাথা গরম হয়ে উঠলো চাটুজ্জে মশায়ের। পায়চারী করতে করতে নেবে এলেন নীচে। বিমু আজ বাইরে শুয়েছে। ঠাণ্ডা না লাগিয়ে বসে। নাঃ ঠাণ্ডা কোথা? বেশ গরমই বরং। কিন্তু গরমেও তো ঠাণ্ডা লাগে ঘামে ভিজে। একী দরজাটা যে খোলা। বিয়ের গহনা রয়েছে না? কি অদ্ভুত নিশ্চিন্তভাবে ঘুমুচ্ছে ছেলেটা। ওর কাছে না গহনা রয়েছে?

অন্ধকারে হাতড়ে হাতড়ে ঘরে ঢুকলেন চাটুজ্জে মশাই। একী, ছেলটা জেগে আছে নাকি? না, ওটা ওর পাঞ্জাবী।

এগুলো কি? খুচরো পয়সা।

এটা আবার কি? চাবি। স্যুটকেশের চাবি।

চাবিটা নিয়ে নাড়াচাড়া করেন চাটুজ্জে মশাই। কিন্তু ও যদি জেগে উঠে, কী ভাববে? যদি দেখে মাঝ রাত্তিরে স্যুটকেশ খুলে গহনা দেখছে, বিমলের বাবা?

হঠাৎ যেন ঘাম হচ্ছে। ঘামটা মুছে ফেললেন হাত দিয়ে। বিমল যদি জানতে পারে? না; দরকার কি ওঁর এসবে। উনি তো আর এই গহনা বেচে মহাল কিনতে যাচ্ছেন না।

একী, স্যুটকেশ খুলে ফেলেছেন তিনি। এই তো গহনাগুলো। বাঃ

বেশ ভারী তো। নিবারণ বাড়ুজ্যে তাহলে ভালই খরচা করেছে। মাথাটা দপ দপ করছে। তাড়াতাড়ি স্যুটকেশটা বন্ধ করে ফেললেন জোরে শব্দ হয়ে গেল নাকি? যঁ্যা, সর্বনাশ উঠে পড়েছে ছেলেটা! এখনি বিমলকে ডাকবে।

বাঘের মত লাফিয়ে পড়লেন চাটুজ্জ্যেমশাই। শব্দ না করতে পারে গলাটা চেপে ধরলেন ছুহাতে। আরো, আরো জোরে।

ষোল বছরের রাধা নয়, কুড়ি বছরের যুবক। তবু এলিয়ে পড়লো দেহটা।

কত বছর পর খুন করলেন তিনি। না না, এ-খুন তিনি স্বেচ্ছায় করেন নি। বাধ্য হয়েছেন।

কাল সকালে সবাই জানবে, কে অরুণকে খুন করে গহনাগুলো চুরি করে নিয়ে গেছে। কিন্তু তাঁকে তো কেউ সন্দেহ করতে পারবে না।

হঠাৎ হোঁচট খেলেন স্যুটকেশে পা লেগে।

—কে, কে, কে? ভয়ার্ত্ত অরুণ চীৎকার করে উঠলো।

পলাতক

ক্রুর কঠিন দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে নায়ার সাহেব।

নায়ার নয় ওটা আরশোলা। কখন যেন নায়ার সাহেব আরশোলা হয়ে গেছে। কেমন ফ্যাকাশে ভীত, অথচ ক্রুরতা-মাখানো ঘৃণ্য চোখ দুটো। না চোখ তো নেই, দুটো বড় বড় সাদা দাগ শুধু।

নায়ারের ছবিটার ওপর আরশোলাটা স্থির হয়ে কতক্ষণ বসে থেকে একটু সন্ত্রস্তভাবে নড়াচড়া করে। নিরীহ, অসহায় একটা পোকামাত্র। নিরীহ, আপাতদৃষ্টিতে নিরীহ, কত বিষ লুকানো আছে ওই কাঁটা কাঁটা পা গুলোয়! আমরা ঘৃণা করি; চীনদেশে খায়। গা-টা শিরশির করে উঠলো মুখার্জীর।

আগন্তুক পোকাটা উড়ে গেল ফরফর করে কোথা থেকে এসে পড়েছিল হঠাৎ বালিগঞ্জের ড্রয়িংরুমে। আউট হাউসের ধোপাটার ঘর থেকে হয়তো তাড়া খেয়েছিল। একটু স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে চুরুটটা ধরালেন মুখার্জী।

কী একটা অদৃশ্য টান আছে নায়ারের। ধোঁয়ার মধ্যে দিয়ে আবার চোখ দুটো চলে যায় সেই ফোটোটার ওপর। ঠিক যেন কুকুর লিও। কিন্তু হঠাৎ যদি লিও একদিন ঘুমন্ত অবস্থায় ওঁর টুঁটি টিপে ধরে!

না, লিওটা তো মানুষ নয় নায়ারের মত! দু-বেলা খাবার আর একটু আদরের বদলে লিও কেনা হয়ে গেছে সারাজীবনের জন্য।

কিন্তু নায়ারও কি হয়নি। এইতো সেদিন তিন বছর আগে নর্থ ইণ্ডিয়া ক্লথ মিলসের দ্বারোদ্‌ঘাটনের সময়ে এই নায়ারই বলেছিল, মুখার্জী তোমার কাছে নায়ার ফ্যামিলি, এই ইনস্টিটিউশন, সারাজীবন কেনা হয়ে থাকবে। আর আজ? বিষণ্ণ তিক্তভাবে হাসেন মুখার্জী।

কোথাকার কে অপগণ্ড প্রভাকরনের অধীনে চাকরি করতে হবে বিকাশ মুখার্জীকে? কে সে, কতটুকু জানে? অর্থাৎ বিশ্বাস করে না নায়ার। যে সারা জীবন ধরে এই ইনস্টিটিউশনকে দাঁড় করালো, পঁচিশ হাজারের ক্যাপিটাল থেকে পাঁচ লাখ লাভ এনে দিল, সে বিশ্বাসী নয়, বিশ্বাসী তোমার ভাগ্নে? কী অক্লেশে রেজিগনেশন লেটারটা নিয়ে নিল নেমকহারাম আনগ্রেটফুল নায়ার!

আমি এর শোধ তুলবো, ইউভারমিন। সারা জীবন ধরে এর প্রতিশোধ আমি নেবো। তোমাকে আমি শেষ করে দেব, নায়ার, লাইক দিস্, নাউ সেভ ইয়োরসেল্ফ।

নায়ারের ফটোটা ভেঙে চুরমার হয়ে গেল। পেপারওয়েটটা ঠিক লেগেছে। আঃ, টেবিলের কাঁচখানা কেন ভাঙলো? এটাকে তো ভাঙতে চাননি তিনি।…কাঁচগুলো যেন হীরের টুকরো। যদি হীরে হত!

ঈস্ প্রবালের মতো টকটকে লাল। রক্ত! আগেকার মানুষ রক্ত খেতো, কেমন স্বাদ রক্তের। মুখে দিতে চিন চিন করে উঠলো হাতটা। একী? একী করছেন? এসব কি ভাবছিলেন তিনি! মাথাটা কি খারাপ হয়ে গেল?

আইডিনের শিশিটা যে কোথায় রাখে ওরা? বেসিনে হাতটা ধুতে গেলেন মুখার্জী।

বলি বলি করেও বলা হল না সুষমাকে। কী বা হবে বলে? শুধু আঘাত দেওয়া। আর কসমোপলিটানের চাকরিটা তো পেয়েই যাচ্ছেন।

সুষমাকে জানালেন চারদিন পরে, নতুন চাকরিটা পাওয়ার পর। অবাক হয়ে বললেন, কী আশ্চর্য, নায়ার সাহেব এমনি করলো? তারপর হয়তো ভুলেই গেলেন, অথবা খুশিই হলেন। ছশো টাকা

আয় তো বাড়লো। উমার বিয়ে আর তপুর বিদেশ যাওয়ার দিন দুটোই তো এগিয়ে আসছে।

মুখার্জীর কাজের চাপ বেড়ে গেছে। নায়ারকে দেখিয়ে দিতে হবে কসমোপলিটানকে বড় করে। এই হবে তাঁর প্রতিশোধ। তাঁকে হারিয়ে যেন নায়ারকে কাঁদতে হয়।

সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝি টুর থেকে ফেরার পর মেহ্‌টা একদিন ডেকে পাঠালেন।—মিঃ মুখার্জী, আপনার সঙ্গে একটা কথা খোলাখুলি আলোচনা করতে চাই।

নিশ্চয়ই, হাসিমুখে বললেন মুখার্জী। কী বলবেন সেটা তো তাঁর অজানা নয়।

—শুনলাম আপনি নাকি নর্থ ইণ্ডিয়া লিমিটেডের বিরুদ্ধে খুব অপপ্রচার করে বেড়াচ্ছেন।

মুখার্জী বললেন, কতকটা সত্যি কথাটা। নিজের কোম্পানীর প্রচার করতে গেলে রাইভালের অপপ্রচারও তো খানিকটা করতে হয়। আর তাছাড়া আমি প্রতিজ্ঞা করেছিলাম আমাকে তাড়ানোর শোধ আমি তুলবো—

মেহ্‌টা হঠাৎ গম্ভীর হয়ে বললেন, আমি চাই আপনি আমার কোম্পানীর কাজই করবেন। অন্য কারো ক্ষতি করা যখন আমাদের উদ্দেশ্য নয় তখন বাজে সময় অপব্যয় করা—

—কি বলছেন মিঃ মেহ্‌টা? আমি কোম্পানীর জন্যে ঠিক মত খাটছি না?

বাধা দিয়ে মেহ্‌টা বলেন, আই নো, আই নো, বাট, আপনি যা করছেন সেটা বিশ্বাসঘাতকতা, আপনি আপনার পুরনো কোম্পানীর সিক্রেট্‌স্ আউট করে দিচ্ছেন। ধরুন, আজ যদি আপনি আমার কোম্পানী ছেড়ে যান, আমার বিরুদ্ধেও তো—

—কী বলছেন আপনি ?

—আমি বলছি,—এটা একটা কোড অব্ অনার, ইউ মাস্ট স্টপ্ দিস্।

মাস্ট আই ?—মাথাটা ঝিম ঝিম করে ওঠে মুখার্জীর।

—না না, উত্তেজিত হবেন না আপনি। আমি মানে—কথাটা কানে এল, তাই আপনাকে একটু সাবধান করে দিলাম আর কি।

মেহ্‌টা থামলেন। মুখার্জীর নিভে যাওয়া চুরুটটা ধরিয়ে দিলেন। তারপর বললেন, হ্যাঁ যে জন্যে ডেকেছিলাম আপনাকে। ভাবছিলাম টুরের পরিশ্রম আর এদিকের খাটুনির পর আপনার উপর ফিনান্সের ব্যাপারটা আবার চাপানো বোধ হয় ঠিক হচ্ছে না। ওটা আপনি শ্রীবাস্তবের ওপরেই ছেড়ে দিন।

মুখার্জীর মুখের দিকে তাকিয়ে আবার ব্যস্ত হয়ে বললেন মেহ্‌টা,—না না, আপনার মাইনে ডেজিগনেশন সবই ঠিক থাকবে। সে সব আমি কিছু মীন করিনি। শুধু অ্যাকাউণ্টসের জন্যে অ্যালাউন্সটা—

—ইয়েস, আই নো হোয়াট ইউ মীন।

মুখার্জী উঠে দাঁড়ালেন। সারা শরীরটায় আগুন ধরে গেছে।

নায়ারের সঙ্গে মেহ্‌টার সাদৃশ্য আছে, আবার নেইও। লম্বা লম্বা আঙুলগুলো মাকড়সার দাড়ার মতো টেবিলের ওপর কি যেন শিকার খুঁজে বেড়াচ্ছে।

পেপারওয়েটটা তুলে নিলেন মুখার্জী ! মাকড়সাটাকে মেরে ফেলতে হবে।

না, ওটা মাকড়সা নয়। মেহ্‌টার হাত। ধীরে ধীরে পেপারওয়েটটা আবার নামিয়ে রাখলেন মুখার্জী। তারপর খস্ খস্ করে একখানা চিঠি লিখে ফেললেন।

চিঠিটা পড়ে মেহ্‌টা ওঁর মুখের দিকে তাকালেন,—হোয়াট ডু ইউ মীন ? না না, এ আমি অ্যাকসেপ্ট করবো না। ইউ আর রং। ভেবে দেখুন দু-দিন, উত্তেজিত হবেন না। আই ডিড নট মীন এনিথিং লাইক ছাট।

—আই য়্যাম নিয়ারিং ফিফ্‌টি, আই নো।

—সত্যিই আমি দুঃখিত, মিঃ মুখার্জী।

বেকার।

অন্ধকার ঘরে বিছানায় বসে বসে ভাবেন মুখার্জী। আশ্চর্য মানুষ। নর্থ ইণ্ডিয়ার ম্যানেজার মুখার্জীকে কেউ কাজ দিল না। তিনি কি বুড়ো হয়ে গেছেন? অথর্ব শক্তিহীন? না অবিশ্বাস করে ওরা? না ভয় পায়? চুলোয় যাক্‌গে। প্রভিডেণ্ট ফাণ্ডের, ইনসিওর‍্যান্সের ছত্রিশ হাজার টাকা আছে তাঁর। নিজের ব্যবসা গড়ে তুলবেন। সুষমাকে এবারও বলা হল না। দশটায় বেরিয়ে পড়া। কণ্ট্রাক্টারির জন্যে এ আপিস সে আপিস—চ্যাটার্জি, মিটার, ভোস, সাকসেনা, সান্যাল। সারাদিন ঘুরে শ্রান্ত সন্ধ্যায় ড্রয়িংরুমে ক্লান্ত শরীরটাকে এলিয়ে দেওয়া।

দিন বদলে গেছে, না মানুষগুলোই বদলেছে? না তিনি নিজে? তাঁর মতো ছোট ব্যবসায়ীর স্থান নেই।…ঘুষ, আরো টাকা, ব্যাকিং। একচেটে হয়ে গেছে সব।

কতদিন! ছ-মাস হয়ে গেল। বন্ধুবান্ধব, আত্মীয়, কারো সঙ্গে দেখা করতে পারেন না। জানে না, তবু জানবে। হয়তো বা জেনেই গেছে। বেকার—অসহায় পাগলের মতো ঘুরে বেড়াচ্ছেন তিনি। আর যেন ঘোরা-ঘুরিও ভালো লাগে না। না, না, না। প্রত্যাখ্যানের প্রতিধ্বনি। এদিকে টাকা ফুরিয়ে আসছে।

এর চেয়ে যদি পালিয়ে যাওয়া যেতো কোথাও? কোথায়, কোথায়? দার্জিলিং, মুশৌরী, নৈনিতাল, বোম্বাই? না বোম্বাই-মাদ্রাজ নয়, কত বন্ধু, কতো পরিচিত; ওখানে নয়। দার্জিলিং মুশৌরীও নয়, কি আছে ওখানে? শুধু তো নির্বাসন নয়, কিছু একটা করতে হবে। সোফা থেকে উঠে পড়ে পায়চারি শুরু করেন মুখার্জী। চুরুটটা

টানা হয় না। কখন নিভে গেছে। দেশলাই জ্বালাতেও যেন মনে থাকে না।

এক সময় মুখার্জী হেসে ওঠেন। বাঃ, এ কথাটা কেন মনে হয়নি তাঁর? কাশ্মার—কাশ্মীর! এক প্রান্তে চেরী, আপেল-পাইনের বন, ডাল-লেক…হাউসবোট,…কত সহজ, শাল কার্পেটের ব্যবসা। আটাশ হাজারকে আটাত্তর হাজার করতে ক-বছর লাগবে?

বহুদিন পরে গলায় সুর আসে কোথা-থেকে। এগিয়ে গেলেন পঁচিশ বছরের বিকাশ মুখার্জীর কাছে। কী রোগা আর করুণ ছিল তখন বিকাশটা। এ পাশে মিঃ মুখার্জী গত বছরের।

চিয়ারিও ওল্ড চ্যাপ! তোমার নিজে ব্যবসা হচ্ছে। ব্যবসায়ী। টাটা, বিড়লা, গোয়েঙ্কা, ডালমিয়া, সিংহানিয়া, আর-এন-মুখার্জী। আর একজনের নামও জড়িয়ে দেব এর সঙ্গে। বাট্, হ্যাঁ বয়সটা একটু বেড়ে গেছে—তবু—তবু—সময় আছে এখনো।

সুষমা, সুষমা—চেঁচিয়ে ডাক দিলেন মুখার্জী। বেয়ারাটা ত্রস্ত হয়ে এসে দাঁড়াল—জী!

—মাইজীকো, বোলাও।

একটু পরে সুষমা এসে ঘরে ঢুকলেন।

—কী কাণ্ড তোমার, বল তো? নাম ধরে এমনি করে ডাকে কখনো? বাড়ীসুদ্ধ চাকর বেয়ারা,—মুখার্জী সুষমার মুখের দিকে তাকিয়ে হাসেন—ওহ্ হো তাই না কি! ভীষণ অপরাধ হয়ে গেছে! আমার বৌকে আমি যা খুশি ডাকবো, তাতে কার কি। সুষমা সুষ্মা—সু—সুমা—

—আঃ, কি হচ্ছে, কেউ শুনে ফেলবে! সুষমা এদিক ওদিক তাকিয়ে কাছে ঘেঁষে এসে বসলেন।

—কি হয়েছে তোমার বল তো আজ? চল, ঘরে যাই। উঃ, কতদিন এমন খুশি দেখিনি তোমাকে—সেই নর্থ ইণ্ডিয়ার পর থেকে। হঠাৎ যেন মনে পড়ে গেল। মুখার্জী বললেন, নর্থ ইণ্ডিয়া! ভাগ্যিস

ছেড়ে ছিলাম তখন, নইলে সারা জীবনটাই পরের চাকরি করতে করতে যেত—

শঙ্কিতভাবে সুষমা স্বামীর মুখের দিকে তাকালেন। হাতটা আস্তে আস্তে ছাড়িয়ে নিয়ে বললেন, তুমি চাকরি করছো না এখন?

—উঁহু, ছেড়ে দিয়েছি অনেকদিন। জানো না তুমি? বলো তো কি করছি এখন?

সুষমা বোকার মতো তাকিয়ে থাকেন। চাকরি নেই অথচ এত হাশিখুশি? স্বামীর সব কিছু দুর্বোধ্য ঠেকছে। হঠাৎ যেন বড় বেশী ছেলেমানুষীতে পেয়েছে ওঁকে। ভয় ভয় করে সুষমার।

—পারলে না তো বলতে? ব্যবসা, ব্যবসা। আটাশ হাজার টাকা আছে আমার। দেখবে বিরাট প্রকাণ্ড একটা ব্যবসা করবো না সু? আচ্ছা আমার কোম্পানীর কি নাম হবে বলো তো। সুষমা ভেনচার্স। হঠাৎ মুখার্জী অতীতে ফিরে যান, তোমাকে নিয়েই তো ভেনচার শুরু করেছি না সু? সেই বি, এস্‌সি পাশ করে আর পড়া হল না। কতো সাধ ছিল বিলেতে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ার। দেখো না, তপুকে কত বড় ইঞ্জিনিয়ার করব আমি। পড়ুক ও কত পড়তে চায়। আচ্ছা মণ্টুকে মনে নেই তোমার? সেই আমাদের বিয়েতে সাক্ষী ছিল? কী যে করল। সারা জীবনটা, পরের জন্যে বিলিয়ে দিল। কতদিন দেখা হয়নি ওর সঙ্গে। জেলে জেলেই কাটল ওর! অনেক কিছু করতে পারতো সে, কিছুই করলো না। কোথায় কী করছে, কী জানি বেঁচে আছে কিনা। ওকে যদি পেতাম! একটা দীর্ঘনিশ্বাস পড়লো মুখার্জীর। —আচ্ছা ওর ফটোটা কোথায় বলতো?

—কেন? শোবার ঘরেই তো রয়েছে।

হঠাৎ যেন নিভে যান মুখার্জী। ক্লান্ত বিষণ্ণভাবে বলেন, এই দেখ কি যেন হয়েছে আমার আজকাল। ভুলে ভুলে যাই। হঠাৎ হঠাৎ অনেক-কথা মনে আসে, কেমন যেন সব গোল পাকিয়ে যায়।

সোফায় শুয়ে পড়ে বলেন, মাথাটা একটু টিপে দেবে?

চমকে ওঠেন সুষমা। —কী হয়েছে তোমার বলো তো। চলো, ঘরে শোবে চলো।

—না, এখানেই। মুখার্জী ছেলেমানুষের মতো গলায় বলেন।

সুষমা চুপ করে মাথা টিপে দেন।

খানিকপরে বলেন, আচ্ছা কিসের ব্যবসা করছ বললে না তো।

—ও হ্যাঁ, তোমাকে তো বলা হয়নি। ঠিক করলাম কাশ্মীরী শাল কার্পেটের ব্যবসা করব আমি। জান সু, কণ্ট্রাক্টারি বলো, অর্ডার সাপ্লাই বলো, ওসব কাজে বড় খোসামুদি আর ঘুষের ব্যাপার। আর তা ছাড়া, এখানে আমি থাকতে পারবো না। চাকরি ছেড়ে দিয়েছি কিনা, লোকে হাসে, অবজ্ঞা করে আমাকে। ব্যবসার জন্যে গেলে ভাব দেখায় যেন কত অনুগ্রহ চাই। যেন ভিক্ষে চাইছি এমনি ব্যবহার করে সব। এর চেয়ে শাল কার্পেটের ব্যবসা অনেক ভালো। শুধু সৌখীন ভদ্র বড়লোকদের কাছে যাওয়া। আর, বেশ লাভ ওতে, জানো। কেমন চমৎকার হবে বলো তো? কাশ্মারে থাকবো আমরা। মাসে মাসে আসবো বেড়াতে, অর্ডার নিতে। তারপর যখন খুব বড়লোক হতে পারব তখন আবার ফিরে আসবো। এখানে বিরাট কারখানা গড়ে তুলব। দেখিয়ে দেবো আমি নায়ার আর মেহ্‌টাদের—আর আর ঐ চ্যাটার্জী, মিটার, ভোস সবাইকে। উত্তেজিত হয়ে উঠে বসেন মুখার্জী।—জান সুষমা, ওরা একটা অর্ডার দিলো না। কেউ একটা চাকরিও দিলো না। এফিসিয়েণ্ট অনেস্ট লোকের দিন নেই। চুরি-ঘুষ—একটু থেমে আবার বলেন—চলো ঘরেই যাই।

সুষমা বলেন, খাবে না এখন? একেবারে খেয়ে নিয়ে শোবে চলো, কেমন?

ঘরের দিকে চলতে চলতে মুখার্জী বলেন, নাঃ আজ আর খাব না। যদি কেউ এসে পড়ে হঠাৎ। চলো, আজই আমরা কাশ্মীরে চলে যাই।

বিছানায় শুইয়ে দিয়ে আতঙ্কিত সুষমা বলেন, ঘুমোও তো একটু।

—তুমি যাবে না?

—কোথায়?

—কাশ্মীরে?

বিব্রত সুষমা বলেন, যাবো বৈকি, পরে যাবো। আগে তুমি যাও, সব ঠিক করে এসো তারপর। এখন কি আমার গেলে চলে উমা তপুকে ফেলে? তুমি ঘুমোও তো এখন। কাল ওসব ঠিক হবে।

—ঘুমোব? আচ্ছা ঘুমোচ্ছি তুমি কাল সব ঠিক করে রেখো কিন্তু। আঃ, কি মজা বলত, হাউস বোট, জাফরানক্ষেত, চেরী, আপেল……

ঘুমন্ত স্বামীর দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে সুষমার বুকে একটা তোলপাড় জাগে। উনি কি পাগল হয়ে যাচ্ছেন? না না না, এ হতে পারে না, কখ্‌খনো না।

কান্না আসে, চোখ দুটো মুছে আলো নিভিয়ে দেন। ছেলেদের খাবার ব্যবস্থা করতে হবে।

সারারাত্রি স্বামীকে পাহারা দিয়েছেন সুষমা। অঘোরে ঘুমোচ্ছেন এখনো। ভোর হয়ে এসেছে।

আঃ কী ক্লান্তি। তবু ভালো লাগছে। কিছু না, ও কিছু না। আটাশ হাজার টাকায় স্বচ্ছন্দে চলে যাবে দু-তিন বছর। এদিকের কতকগুলি খরচ সহজেই কমানো যায় এখন। তারপর তপু ইঞ্জিনিয়ার হয়ে ফিরে আসবে। কিসের ভয় তাঁর তপু থাকতে? গেলই বা চাকরি ওঁর?

আর ওঁকে চাকরি করতে দেবেন না। ব্যবসাও নয়। দরকার কি এই বয়সে আবার নতুন করে ব্যবসায় নেমে? এমনি করে আবার দিন-রাত চিন্তা আর খাটুনি! কিছু নয়, তবু যদি কিছু হয়।

স্নান সেরে ঘরে এসে দেখলেন মুখহাত ধোয়া হয়ে গেছে ওঁর। গত-রাত্রির বিবর্ণ উচ্ছ্বাসের চিহ্নমাত্র নেই।

সহজভাবে আবার আগের মতোই বেরিয়ে যান মুখার্জী। কোথাও ক্রটি নেই। শুধু একটু চিন্তান্বিত মনে হয়, আর সন্ধ্যায় বাড়িতে ফিরেও চিঠিপত্র লেখেন অনেক রাত্রি পর্যন্ত। সুষমার অবসর মেলে না।

না, কোথাও কিছু বিপর্যয় ঘটেনি। হয়তো সবই ঠিক আছে, হয়তো চাকরি পেয়েছেন একটা। তবু কোথায় একটা অস্বাভাবিকতা অনুভব করেন সুষমা। কেমন হঠাৎ একটু বেশী ছেলেমানুষ হয়ে যান মাঝে মাঝে। আর সেদিনের সেই সন্ধ্যার ঘটনাটা যেন একেবারে ভুলেই গেছেন। কেন সেদিন অমন কথা বলছিলেন? ভয় করে সুষমার সে কথা তুলতে। এমনি তো বেশ আছেন। যদি, যদি আবার সেদিনের মতো—না, না, ভুলে থাকাই ভাল। এ যেন চরম একটা বিপদের খবর জেনেও চেপে যাওয়া। যদি সত্যি হয়ে যায়, ভালো করে খবর নিতে গিয়ে? মাসখানেক পরে মুখার্জী সত্যিই চলে গেলেন কাশ্মীর। ফিরে এলেন দিন পনের পরে। আর তারও দিন দশেক পরে এল এক লরী কার্পেট আর শাল।

এবারে অভিমান হয় সুষমার। বেশ, সেই রাত্রের পর থেকে একদিনও ভাল করে কথা বলেন নি। তারপর চিন্তা হয় কত টাকার জিনিস এসব। সত্যিই কি বিক্রি হবে এগুলো? এসব কি অদ্ভুত খেয়াল ওঁর? চাকরি নেই, তবু তো টাকা আছে এখন। এমনি করে যদি টাকাগুলো শেষ হয়ে যায়? কেন উনি বলেন না খুলে সব কথা? শুধু চেপে যান। কেন? তাঁর কাছেও কি লজ্জা করে ওঁর চাকরি না থাকার জন্যে? সেই অদ্ভুত সন্ধ্যায় যা বলে ফেলেছেন সেইটুকু ছাড়া একদিনও তাঁর সঙ্গে পরামর্শ করেননি উনি। বেশ, উনিও যদি আর কোন কথা শুধিয়েছেন। করুন ওঁর যা খুশি।

সুষমার আশঙ্কাই সত্যি হল। পাঁচ মাসে মাত্র তিনখানা কার্পেট আর খানছয়েক শাল বিক্রি হয়েছে। এদিকে চিঠি লেখার অন্ত নেই, গাড়ি চড়ারও বিরাম নেই। অন্তত পেট্রোলের খরচাটাও কী উঠেছে? কে জানে? সুষমা জানেন না।

এমাসে সংসার খরচের টাকা পাননি তখনো পর্যন্ত। নিজেই গেলেন টাকা চাইতে।

টাইপরাইটার থেকে মাথা তুলে মুখার্জী বললেন, ও, টাকা দিইনি তোমাকে। দেখছি দাঁড়াও।

ড্রয়ারটা টেনে চিন্তিত হয়ে পড়লেন। তাইতো টাকা কই?

তারপর চেক বইটা বের করে পাঁচশো টাকার একখানা চেক লিখে দিয়ে বললেন—কোনরকম করে চালিয়ে নাও এমাসটা। পরের মাসে ওগুলো সব বিক্রি হয়ে যাবে। ধনীরাম সব নিয়ে নেবে বলেছে। পাইকারী বিক্রিতে অবশ্য লাভ একটু কম। কিন্তু ঝঞ্ঝাট কম বুঝলে না?

সুষমার মাথায় যেন কি চেপে গেলে। হঠাৎ টেবিল থেকে ব্যাঙ্কের খাতাটা তুলে নিলেন, দেখবো, আমি আজ কত টাকা নষ্ট করেছো তুমি।

মুখার্জী লাফিয়ে উঠলেন, দেখো না, দেখো না বলছি, পায়ে পড়ি তোমার। দাও, দিয়ে দাও আমাকে। আমি দিচ্ছি, আটশোই দিচ্ছি তোমাকে।

কেড়ে নিতে হল না। স্তম্ভিত সুষমার হাত থেকে পড়ে গেল বইটা।

—মাত্র এগারোশো?

মুখার্জী ফেটে পড়লেন এবার—কেন, কেন দেখলে তুমি আমার পাশ বই? বেরিয়ে যাও, বেরিয়ে যাও আমার ঘর থেকে—

সুষমাকে ধাক্কা দিয়ে বার করে দিলেন মুখার্জী। তারপর ত্রস্ত হাতে ব্যাঙ্কের বইটা ড্রয়ারে বন্ধ করে ফেললেন। এখুনি যেন কেউ সেটা কেড়ে নেবে। বিন্দু বিন্দু ঘাম জমে গেছে কপালে। দেহে মনে কেমন একটা অদ্ভুত যন্ত্রণা।

কেমন করে আর মুখ দেখাবেন ! সুষমা জেনে গেছে, তপু জানবে, উমা জানবে,—বেকার, গরীব, অথর্ব হয়ে গেছেন মুখার্জী। অথর্বই তো, পঁচিশ হাজারকে যে পঁচিশ লাখ করতে পারে, সে পাঁচ মাসে বিশ হাজার টাকার শাল কার্পেট বিক্রি করতে পারে না ? এতগুলো টাকা যদি সত্যিই নষ্ট হয়ে যায়, যদি ধনীরাম না নেয় এগুলো ? তপু পড়তে যাবে কী করে ? উমার বিয়ের কী হবে ? শেষ পর্যন্ত কি না খেতে পেয়ে শুকিয়ে মরবেন সবাই মিলে ?

শিউরে ওঠেন মুখার্জী। সেদিন আর শুতে যান না ঘরে। উমা এসে খাইয়ে যায়।

ঘুম আসে না। উদ্ভট এলোমেলো চিন্তা। আচ্ছা, সুইসাইড করলে কি নতুন ইনসিওরেন্সের টাকাটা পাবে ওরা ? হয়তো পাবে, কিন্তু কী বলবে লোকে। শত্রুরা হাসবে, পরিচিত আত্মীয়রা করুণা করবে, বলবে, চাকরি যাওয়ার পর কাপুরুষের মত আত্মহত্যা করেছে বিকাশ মুখার্জী। না, না, এ সহ্য করতে পারবেন না তিনি।

পরের দিন সকালে গাড়ি নিয়ে আবার বার হলেন শেষবারের মত। ফিরে এলেন ছ-হাজার টাকা নিয়ে।

আজ থেকে আর বার হবেন না। বিকাশ মুখার্জীকে ভাড়া করা ট্যাক্সিতে দেখলে কী ভাববে লোকে। তার থেকে ঘরে বসে চিঠি লেখা ভালো। আর যাবেনই বা কোথায় ! জানাশোনা গণ্ডি, ফোন গাইডের ঠিকানা সবই তো শেষ হয়ে গেছে তাঁর।

সেদিন থেকে মুখার্জী নিজের ঘরে বন্দী করলেন নিজেকে। চিঠি আর হিসেব। টাকা, কার্পেট, শাল। সুষমা না, তপু না, এমন কি রাজসিং-ও না। কেউ আসবে না তাঁর ঘরে। কারো সঙ্গে কথা নেই তাঁর।

শুধু উমা আসে খাবার নিয়ে, টুকিটাকি কথা হয় ব্যবসার। ওতো যাবে ক-দিন বাদে পরের ঘরে, উমার কাছে লজ্জা করে না। সেও

নিজে থেকে ওসব কথা শুধোয় না কোন দিন। শুধু গল্প করে ওর কলেজের বন্ধুদের, পার্টি-পিকনিকের।

লুকিয়ে থাকেন মুখার্জী। মুখার্জী কলকাতায় নেই, বোলো কাশ্মীর গেছে। কাশ্মীরই তো। চেরী, পাইন, আপেল, লেক, হাউসবোট, পাহাড়—এইতো, এইতো সব। কার্পেটগুলো বিছিয়ে বিছিয়ে টাঙিয়ে রাখেন ঘরে।

মাস তিনেক পরে সুষমা ডেকে পাঠান ধনীরামকে। তপুর পরীক্ষা শুরু হয়েছে, এবার তো টাকার ব্যবস্থা করতেই হবে।

ধনীরাম জানে, খবর রাখে সবই। বলে, নিতে তো পারি মাইজী, আপনি যখন বলছেন, আর মুকরজী সাবকা এসি হাল। লেকিন্ মাল তো পড়িয়া থাকবে—

সুষমা বলেন, আপনিই বলুন কত হলে পারবেন।

ইতস্ততঃ করে ধনীরাম বলে, হাজার পঁদরা হোলে—

সুষমা তাতেই রাজী হয়ে গেলেন। তপুর বিলাত যাওয়ার পর আরো দু-বছর চালাতে হবে। সংসার খরচের টাকাটা তো উঠে আসবে, না হয় এ বাসাটা ছেড়েই দেবেন। ধনীরামের সঙ্গে কথা ঠিক করে সুষমা স্বামীর ঘরে এলেন ভয়ে ভয়ে।

আশ্চর্য মুখার্জী হাসিমুখে অভ্যর্থনা করেন, কী তুমিও চলে এসেছ, ভালো করেছ। তখন বল্‌লাম না পালিয়ে এসো।

সুষমা আস্তে আস্তে বলেন, তপুর পরীক্ষা শুরু হয়েছে। ওর বাইরে যাবার টাকাটা—।

চিন্তিতভাবে মুখার্জী বলেন, হ্যাঁ তাই তো।

সুষমা বলেন, ধনীরাম এসেছিল, এগুলো—

হঠাৎ মুখার্জী হেসে ওঠেন, তুমি কি পাগল হয়ে গেছ। এগুলো বিক্রি করবে? এই লেক্ পাহাড় সব? তুমি কি মহারাজা হরিসিং? আমরা তো এর মালিক নই, আমরা শুধু বেড়াতে এসেছি এখানে। তুমি বড্ড বোকা হয়ে যাচ্ছ

ছলছল চোখে সুষমা বলেন, তপুকে বিলাত পাঠাবে না তুমি? এ মাসের টাকা দেবে না?

—ওহ্ হো, তাই তো। দেব বৈকি, নিশ্চয়ই দেব।

পাশ-বইটা বার করে পাঁচ হাজার টাকার চেক লিখে ফেলেন মুখার্জী।

হায় ভগবান, ব্যাঙ্কে যে পাঁচশোও নেই। অর্থহীন চেকখানা নিয়ে বেরিয়ে যান সুষমা।

তপনের ঘরে গিয়ে চোখ মুছে বলেন, তপু, একটা ব্যবস্থা তো করতেই হবে, বাবা।

তপন বই থেকে মাথা তুলে বলে, কী ব্যবস্থা করবো আমি, মা? বাবা তো এমনিতেই কোন কথা শুনতে চান না।

উদাস দৃষ্টিতে তাকায় তপন। ফরেনে যাওয়ার স্বপ্নটা বুঝি ওই আকাশের কোলে বিলীন হয়ে যাচ্ছে।

—কিন্তু তপু, তোর পড়তে যাওয়ার খরচ—

—বাবার যখন এই অবস্থা, কেমন করে আর হবে মা? পরীক্ষাটা হয়ে যাক, একটা চাকরি দেখে নেব। কিন্তু এমনিও তো খরচা কমাতে হবে। চলো বাড়িটা ছেড়ে দিই, কী আর হবে এতবড় বাড়িতে?

—আমিও তো তাই ভাবছি তপু, কিন্তু উনি যদি—ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠেন সুষমা। নিশুতি রাতে পদ্মার বুকে ঢেউ উঠেছে যেন।

উমা ঘরে ঢুকে অবাক হয়ে যায়। কী হয়েছে মা? দাদা—

তপন বলে, শুনেছিস তো কিছু কিছু। ধনীরাম এসেছিল, কার্পেটগুলো নিতে রাজী হয়েছে। কিন্তু বাবাকে তো জানিস। ঘর থেকে ওগুলো বার করা যাবে কী করে? তাছাড়া বাড়িটাও তো ছেড়ে দিতে হবে এতগুলো টাকা গোণা মাসে মাসে—

—ওঃ এই কথা। আমি দিচ্ছি সব ব্যবস্থা করে। উমা এমন ভাবে কথাটা বলে যেন দোকান থেকে এক প্যাকেট সিগারেট এনে দিতে বলেছে তপন।

সুষমা উমার ছেলেমানুষিতে রেগে যান।—তোকে আর বাহাদুরি করতে হবে না। কী করতে গিয়ে কী করে বসবি।—এদিকে তো দেখলাম না কোনদিন বাড়ির একটু খোঁজ নিতে—

—বারে আমার সময় কোথা ? আর আমাকে বলেছ কিছু কোনদিন ? সুষমা বিরক্ত হয়ে বলেন, বলতে হবে কেন ? বুঝিস না ? তারপর কী ভেবে বলেন, যা না ব্যবস্থা কর দেখি।

—দেখো, পারি কি না। বাবাকে আমি রোজ খাওয়াই না ? এতগুলো টাকা আটকে থাকবে আর দাদার পড়া হবে না, তাই হয় নাকি ?

তপন বলে, শুধু পড়া না রে উমা। সংসারের টাকাও তো চাই। উমা বললে, বেশ তো।

আশ্চর্য মেয়ে উমা। সত্যিই সে ব্যবস্থা করলো। মুখার্জী প্রথমে শুনে আঁতকে উঠেছিলেন; উমা কি বোঝালো সেই জানে। শেষে একদিন রাত্রিবেলা বালিগঞ্জের বাংলো ছেড়ে উঠে এলেন সবাই বাগবাজারে। ধনীরাম শাল কার্পেটগুলো নিয়ে নিল ওই দরে, আর তার বদলে মুখার্জীর নতুন বাসার ছোট ঘরটায় এল কতকগুলো পাহাড়-জঙ্গলের ছবি।

ছবি নিয়ে খেলেন মুখার্জী, ভুলে গেছেন কাশ্মীর আর শাল কার্পেটের ব্যবসার কথা। সুষমা তপনের কথাও কোনদিন শুধান না আর। উমা ছাড়া আর কেউ নেই তাঁর। স্বপ্নের মত মাঝে মাঝে মনে পড়ে তপন বলে কে যেন ছিল তাঁর। তাকে খাওয়াতে পারেননি, না কী অসুখ হয়েছিল চিকিৎসা করানো যায়নি, না কী একটা আবদার ধরেছিল, তারপর না পেয়ে কাঁদতে কাঁদতে নিরুদ্দেশ হয়ে গেল। না কি মরেই গেছে, ভালো করে মনে পড়ে না তাঁর। আর সুষমা ? সে তো সেই রাগ করে চলে গেছে কোথায়।

উমা জানে তপনের জন্যেই সবচেয়ে বড় লজ্জা বাবার। সে-ও কোনদিনও কথা তোলে না। থাকুন না ভুলে। অন্য কোন গোলমাল তো করেন না। শেষ পর্যন্ত যদি জ্ঞান ফেরাতে গিয়ে উন্মাদ হয়ে যান?

নিজেকে গুটিয়ে নিয়েছেন মুখার্জী। বাইরের আলো বাতাস মানুষ—সব কিছুকে ভয় তাঁর। ভয় না লজ্জা, তাও তিনি জানেন না। শুধু মনে হয় জীবনটা তাঁর ব্যর্থ হয়ে গেছে। সব সাধ ভেঙে গুঁড়িয়ে গেছে নায়ার আর মেহ্‌টাদের ষড়যন্ত্রে। আজ যদি এই ঘরের মধ্যে ওদের কাউকে পেতেন—না না কারো সঙ্গে দেখা করতে চান না। এ কী কম লজ্জা। আক্রোশে ক্ষোভে কান্না এসে পড়ে মুখার্জীর।

তপন পড়তে চলে গেছে। মুখার্জী কিছুই জানেন না। কেউ জানায়ও না, যদি কোন গোলমাল হয়ে যায়? উমার পরীক্ষার খবর বার হতে সে একটা চাকরি জুটিয়ে নিয়েছে। মার কাছে হাত খরচের টাকা চাইতে লজ্জা করে এখন। বরং কিছু সাহায্যই করতে হয়।

এদিকে দিন কাটে সুষমার একা একা। নিঃসঙ্গ বিষণ্ণ বেদনাময় এক একটি দীর্ঘ দিন। তিনশো পঁয়ষট্টি দিন কেটে যায়, আরো কয়েকটা উৎকণ্ঠ দিন। মাঝে মাঝে তপনের চিঠি আসে সান্ত্বনার মতো। আরো ছ-মাস। কতদিন, কত ঘণ্টা, কতগুলি মুহূর্ত? সুষমার হিসেবে আসে না।

শুধু রবিবারটুকুই অবসর। বহু প্রত্যাশিত ছুটির দুপুর। হয়তো একটু তন্দ্রাই এসেছিল উমার। মায়ের ডাকে ওঠে বসে চোখ রগড়ে।

—দেখতো উমা কে যেন ডাকছে বাইরে।

নেমে এল উমা।

কে ?

আধবুড়ো গ্রাম্য ধরণের একটি ভদ্রলোক! জবাব দেন না। আপাদমস্তক দেখেন উমাকে। তারপর হঠাৎ একসময় হেসে ওঠেন, -- কিরে বুড়ী, চিনতে পারলি না তো ?

উমা আরো অবাক হয়। বাবা ছাড়া আর তো কেউ কখনো বুড়ী বলে ডাকে না তাকে। কী করে জানলো এই লোকটি। থতিয়ে গিয়ে বলে, আপনি—আমি ঠিক—।

—তা আর চিনবি কী করে ? উঃ সে কি আর দু-এক বছর, দশ বছর, হয়ে গেল। তারপর তোর দাদা কোথায়, তপু ?

—দাদা তো লণ্ডনে গেছে পড়তে। আরো অবাক লাগে উমার; অথচ নামটা কিছুতেই বলছেন না লোকটি।

—তোর বাবা কোথায় ? নিশ্চয়ই সেই টো-টো করছে। বাপু অতো কিসের, করিস্ তো চাকরি, হ'ত নিজের না হয় বুঝতাম। তা কিরে দরজা ধরে দাঁড়িয়েই যে রইলি, ঢুকতে দিবি না ?

উমা অপ্রস্তুত হয়ে বলে, আসুন।

ভিতরে এসে ভদ্রলোক বলেন—আসতে তো বললি, কে বলতো আমি ?

উমার মুখের দিকে তাকিয়ে বোঝেন সে বলতে পারবে না। নিজেই বলেন, তারপর, মণ্টু কাকা, মনে পড়ছে এবার ?

উমা পায়ের ধুলো নেয়, কাকাবাবু আপনি ?

মণ্টুকাকা বলেন, বিকুটা ফিরবে কখন ? উঃ কী হয়রানিটাই হলাম। কোথায় বালিগঞ্জ আর কোথায় বাগ্‌বাজার।

উমা বিষণ্ণ কণ্ঠে বলে, বাবা তো আজকাল বেরোন না কোথাও কাকাবাবু।

—কেন ? সিঁড়ির উপরেই থমকে দাঁড়ান মণ্টুকাকা।

—বাবা তো দু-বছর ধরে বেকার—চাকরি ছেড়ে অবধি। তারপর এখন প্রায় পাগলের মতো। উমা মুখ নীচু করে।

—সে কিরে? কী বলছিস? তার মানে? কই কোথা সে? বিকু-বিকু—

বহুদিনের পরে পুরনো নাম ধরে ডাকতে শুনে চমকে উঠলেন সুষমা। দ্রুতপায়ে নেমে এসে মণ্টুবাবুকে দেখে অবাক হয়ে বললেন

—আপনি?

—আমিই তো, চিনতে পারছেন? কেমন আছেন?

সুষমার মুখটা ক্লান্তভাবে বিকৃত হয় শুধু। সেটা হাসি না কান্না বোঝা যায় না। উমা এই অবসরে চলে যায়।

মণ্টুকাকা সামলে নিয়ে বলেন, কই আমাকে তো কিছু জানাননি বৌদি। উমা বলছিল—কোথা গেল সে?

সুষমা বলেন, ও বোধ হয় চা করছে? কিন্তু আপনার ঠিকানা কোথা পাব বলুন যে জানাবো।

অপ্রতিভভাবে মণ্টুকাকা বলেন, তা অবশ্য বটে। এই তো ছাড়া পেলাম পরশু, পাটনা থেকে আসছি। আর আমারও হয়েছে—বৌ ছেলেদেরই খোঁজ রাখি ক-দিন। কিন্তু গেল কোথা সে? এ কে?

শিশুর মত টলতে টলতে এসে দাঁড়িয়েছেন মুখার্জী।—কে কে ডাকলো আমাকে?

দুই বন্ধু মুখোমুখি তাকিয়ে থাকেন।

আস্তে আস্তে অনেক পরে মণ্টুবাবু বলেন, তুই সেই বিকু, এই অবস্থা তোর?

—তুই, তুই, মণ্টু! মুখার্জীর গলার আবেগ স্বাভাবিক মানুষের মতো।

মণ্টুবাবুর চোখ দুটো উজ্জ্বল হয়ে ওঠে এবার। হাত ধরে বসান বন্ধুকে। —কী হয়েছে কি তোর বলতো। এ সব কি?

—আমি, আমি কী যেন হয়ে গেছি কিছুই বুঝতে পারি না, মণ্টু। অনেক অনেক কিছু ভাবি, খেই পাই না, সব হারিয়ে যায়। যখন জ্ঞান ফিরে আসে, ভয় হয় আমি কি পাগল হয়ে যাচ্ছি? ভাবতেও

ভয় হয়। বলবো তোকে সব। তুই কি করছিস বল্, ভালো আছিস সব, কোথা থেকে এলি এতদিন পরে?

মণ্টুবাবু বললেন, আমি এলাম চুলো থেকে, যেখানে আমার জায়গা। কিন্তু তোর এ অবস্থা কী করে হল তাই বল্।

ধীরে ধীরে মাথা নাড়েন মুখার্জী, সব নষ্ট হয়ে গেল, আমরা সব নষ্ট হয়ে গেলাম, তোর মত ছেলে সারা জীবনটাই মাটি করে ফেললো—

মণ্টুবাবু হঠাৎ জ্বলে ওঠেন যেন। —নষ্ট, আমার জীবনকে নষ্ট বলছিস তুই। কোনদিন কাঁদতে দেখেছিস তুই আমাকে? ভয় পেতে দেখেছিস? আমার মতো আনন্দ করতে দেখেছিস কাউকে? বেঁচে নেই আমি? আমার বৌ ছেলে মা বেঁচে নেই? সব আছে। কষ্ট করছে, তবু হাসিমুখে আছে, কাঁদে না তোদের মতো। তোর ছেলে বিলাত গেছে কয়েক হাজার টাকা খরচ করে, ফিরে আসবে বড় ইঞ্জিনিয়ার কি ডাক্তার হয়ে, তবু তোর জীবন নষ্ট হয়ে গেল? পাগল হয়ে গেলি তুই—

চমকে উঠে মুখার্জী বলেন, কী, কী বললি তুই, তপু, তপু বিলাত গেছে? সত্যি, সত্যি, বলছিস?

উমা নীচে থেকে উঠে এসেছে কখন। মণ্টুকাকার ছোঁয়াচ লেগেছে তার মনে। বলে, হ্যাঁ বাবা সত্যি, আর ছ-মাস পরেই তো পাশ করবে দাদা। মুখার্জী বিস্মিত অনুযোগের সুরে বলেন, তোরা আমাকে কিচ্ছু বলিস না উমা, আমি কিচ্ছু জানি না।

উমা চাপা দেয় কথাটা। সহজ ভাবে বলে, কত কথাই তো তুমি জানো না বাবা, আমি যে চাকরি করছি জানতে তুমি?

—তুই, তুই চাকরি করছিস?

—হ্যাঁ, বাবা না করলে সংসার চলবে কী করে? দাদা পড়তে যেত কী করে? তোমার যে অসুখ করেছিল বাবা।

তারপর মণ্টুবাবুর দিকে ফিরে বলে, বসুন কাকাবাবু ছ-মিনিটের মধ্যে চা নিয়ে আসছি।

উমা চলে গেলে মুখার্জী অস্ফুটস্বরে বলেন, উমা চাকরি করছে—

মণ্টুবাবু তীক্ষ্ণকণ্ঠে বলেন, হ্যাঁ, আর তুমি পাগল হয়ে বসে আছ।

সুরমা বেদনার্ত গলায় বলেন, মণ্টুবাবু, ওঁকে এসব—

মণ্টুবাবুর যেন সম্বিৎ ফিরে আসে, ও হ্যাঁ, তাইতো কী বা হবে বলে। দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে আবার ক্লান্তভাবে বলেন, ক্ষেপে যাই বৌদি এই মরবিডিটি দেখলে। জীবনটার অর্থ যেন শুধু টাকা রোজগার করা। এতটুকু সাহস নেই, প্রাণ নেই, আনন্দ নেই। বিকুটা সুদ্ধু ডুবে গেল, বড় দুঃখ হয় বৌদি। এতটুকু বাঁচার চেষ্টা নেই? পড়ে পড়ে মার খাবে, তবু উঠে দাঁড়াবে না সাহস করে। রেস খেলবে, লটারীর টিকিট কিনবে, পাগল হয়ে যাবে, আত্মহত্যা করবে, তবু বাঁচার চেষ্টা করবে না। অথচ উমার মত মেয়েও তো রয়েছে।

চুপ করেন মণ্টুবাবু। একটা তীব্র ক্ষোভের ছাই দিয়ে যেন জ্বলন্ত আগুনটাকে চাপা দিলেন।

খানিক পরে স্তব্ধতা ভেঙে মুখার্জী বলেন, হয়তো তোর কথাই ঠিক মণ্টু। তোর মতো মন নিয়ে বাঁচতে পারলে সব ভয় চলে যায়। দেখিস্ তুই, ঠিক ভালো হয়ে উঠবো আমি এবার। কি বল, পারবো না?

উমা চা নিয়ে ঘরে ঢুকলো, বললে, পারবে বৈকি বাবা। তোমার অসুখ তো ভালো হয়ে গেছে।

পরিস্থিতি

চল্লিশ ডিগ্রী শীতের ওপর বর্ষা নেমেছে ভোর থেকে। সীসে ভারী আকাশ ভেঙে কান্না ঝরছে টিপ্ টিপ্। বরফ ভেজা কন্‌কনে হাওয়া আসছে এলোমেলো। মন্থর বিষণ্ণ দিনটা গড়িয়ে চলেছে। সেই যে সকাল বেলায় নলিনী খাবার সময় একবার উঠেছিল তারপর আর বিছানা থেকে নামেনি। এমন কি সাতাশ নম্বরে গিয়ে তাসের আড্ডায় যোগ দেবার উৎসাহটুকু পর্যন্ত নেই।

ক্লান্ত মনের তিক্ত রোমন্থন ছাড়া আজকের এই বর্ষাঘন রবিবারটার কোন মূল্য নেই। শুধু পাঁচটা টাকার অভাব এমন একটা ছুটির রোমাঞ্চকে মুছে দিতে পারে কে ভেবেছিল আগে।

সুরমা দিন তিনেক আগে বলেছিল। প্রত্যেকবারই বলে, পাঁচ দশ টাকার জন্য কোনদিনই ভাবেনি নলিনী। যে কোন মুহূর্তে, এমন কি তিরিশ তারিখেও, যোগেন পঁচিশ-ত্রিশ টাকা ধার দিয়ে এসেছে বরাবর। কিন্তু এবার-যে এমন করে ডোবাবে কে জানতো। শনিবার, মাসের চব্বিশ তারিখেই বলে বসলো, টাকা তো নেইরে, রেডিও কিনেছি একটা এমাসে।

কী দরকার ছিল যোগেনের রেডিও কেনার? আর কিনলোই যদি আড়াই শো টাকাতেও তো পাওয়া যায়, তাই নিলেই হত। সব টাকাগুলো নিঃশেষ করে ফেলার কী মানে হয় ওর? হন্তদন্ত হয়ে শেষ মুহূর্তে এর কাছে তার কাছে এমন কি বুড়ো চাপরাশীটার কাছে পর্যন্ত খোঁজ করেছে সে, পায়নি।

সেই সকাল থেকে কথা বলেনি সুরমা, সারা দুপুরটা কী করছে ও ঘরে বসে সেই জানে। সুরমার তিক্ত কথাগুলো মনের মধ্যে নাড়াচাড়া করতে করতে সারা জীবনের অপূর্ণতার কথাটাই ভাবছিল নলিনী।

লোয়ার ডিভিশনের কেরানীর পদ থেকে কোনদিন কি সে স্বচ্ছন্দ জীবনের মুখ দেখতে পাবে? কী করছে সে? কিছুই না। একশো তেতাল্লিশ টাকা মাইনেয় কোন মতে বেঁচে আছে শুধু, আপিস ক'রে, ডিকেটটিভ নভেল পড়ে, তাস খেলে, আর ক্বচিৎ কখনো বাংলা সিনেমা দেখে।

হঠাৎ আজ প্রবীণের মতো হিসেব নিতে বসেছে নলিনী। ডিটেকটিভ নভেলটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে, ক্রসওয়ার্ডের কাগজপত্রগুলো গুটিয়ে রেখেছে বিছানার নীচে, কিছুই করছে না, শুধু একটির পর একটি ধারে আনা সিগারেট পুড়িয়ে চলেছে, আর ভাবছে। রেগে উঠছে নিজের ওপর, সুরমার ওপর, যোগেনের ওপর, নাক-উঁচু নতুন অফিসারটার ওপর, এমন কি সারা দুনিয়াটার ওপর।

এক পশলা জোর বৃষ্টি এল বুঝি। বৃষ্টির কণা আসছে আধ-খোলা জানালাটার ফাঁক দিয়ে। শেষ বাতাসটাকেও আটকে দিল নলিনী। ভিতরের দরজটা ওদিক থেকে বন্ধ কিন্তু মাঝখানের দরজাটা শুধু ভেজানো। ইচ্ছে করলেই ও ঘরে উঠে যেতে পারে, সুরমার সঙ্গে ঝগড়াটা মিটিয়ে নিতে পারে, বর্ষণমুখর বিকালটা ঘরে বসেই সুন্দর করে তুলতে পারে নলিনী, সে সব কিন্তু কিছুই করলো না, শুধু বন্ধ জানালার কাঁচের ভিতর দিয়ে তাকিয়ে রইলো রাস্তাটার দিকে।

দেখতে, দেখতে দু-পাশের জল এসে জমতে জমতে শেষ পর্যন্ত মাঝখানের ক্ষীণ অ্যাসফল্ট রেখাটাকে ডুবিয়ে দিলো। মোটর আর টাঙ্গার সংখ্যা কমে এসেছে, লোক চলছে কদাচিৎ। গাছগুলো মাথা কুটছে এ-ওর গায়ে, আকাশে। কী চায় ওরা?

অনেকক্ষণ বন্ধ থেকে গরম হয়ে উঠেছে ঘরটা, মাথা থেকে চাদরটা নামালো না নলিনী, জানালাটা খুলে দিল। নাঃ, ছাঁটটা অন্যদিকে চলে গেছে। আহ্‌হা, রাস্তাটার ওপর জল জমে গেছে এক হাঁটু। মোটরটা ওদিকেই চলেছে যে, বেশ তো যাচ্ছে জলের মধ্যেও। নাঃ, বন্ধ হয়ে গেছে এবার। মনে মনে খুশি হয়ে উঠলো নলিনী। খুব যে মোটর

দেখাচ্ছিলে, যাও যাও এবার। অসহায়ভাবে ইঞ্জিনটা গর্জন করলো বার চারেক তারপর বুঝি আর সাড়াই দিল না।

টাঙ্গাওয়ালাটা যেতে যেতে চাবুক উঠিয়ে হাসলো একবার। ত্রিপল জড়িয়ে বসে আছে সে, তার গাড়ি আটকাবে না।

ভদ্রলোকটি নেমেছে জলের মধ্যে, হুডটা খুলে কী যেন দেখছেন। নলিনী মনে মনে বলে উঠলো, দেখলে কী হবে? ইঞ্জিনে জল ঢুকেছে সাহেব, ও আর চলবে না এখন।

নলিনীর কথাগুলো ভদ্রলোকের কানে পৌঁছুলো নাকি? হুডটা বন্ধ করে সেই ছপ্‌ছপ্‌ জলের মধ্যে দিয়ে রঞ্জিৎ সিং রোডের 'বি'টাইপ কোয়ার্টারগুলোর দিকে এগিয়ে গেলেন এবার।

স্যুটটার অবস্থা দেখে আর একবার নলিনী হাসলো। লাফিয়ে লাফিয়ে চলেছেন ভদ্রলোক।

নলিনী তারপর জানালাটা বন্ধ করে দিল।

লালাজীর দোকান থেকেই চড়া দামে আলুপেঁয়াজ আনতে হবে, হয়তো কয়লার জন্য ওর কাছ থেকেই আট আনা পয়সা ধার করতে হবে আজ, ওই জল ভেঙে তাকেও হাঁটুর ওপর কাপড় তুলে লাফিয়ে লাফিয়ে যেতে হবে, তবু নলিনী হাসলো। মোটরওয়লা লোককে বিপাকে পড়তে দেখলে কার না আনন্দ হয়।

বিছানায় উঠে বসে ক্রসওয়ার্ডের কাগজগুলো বার করলো এবার নলিনী। রেঞ্জার্সে'র টিকিট, আর ক্রসওয়ার্ড, ছোটখাট দু-এক টাকার লটারী বাদ দেয় না সে কোনটাই। চান্স কম কিন্তু কেউ না কেউ তো পায়। সে যে কেউ তো সে-ও হয়ে যেতে পারে। আর এছাড়া তো স্বচ্ছন্দ জীবনের সম্ভাবনা দূরের কথা, আশাটুকু পর্যন্ত নেই।

সন্ধ্যার আগেই অন্ধকার ঘনিয়ে এসেছে, উঠে লাইটটা জ্বালিয়ে দেবার মতো মনের অবস্থাও নয় নলিনীর। আধখোলা জানালা দিয়ে পালিয়ে

আসা হাওয়াটুকু হাড় পর্যন্ত কাঁপিয়ে দিচ্ছে মাঝে মাঝে, বিছানার ওপাশটা বরফের মতো ভিজে, ঠাণ্ডা। নলিনী এবার লেপটা টেনে নিয়ে বুক পর্যন্ত ঢেকে শুয়ে পড়লো। তারপর স্বপ্ন দেখতে লাগলো সেই অসম্ভাব্য দিনগুলোর, যদি সে ফার্স্ট প্রাইজটা পেয়ে যায়।

জল ভেঙে এগিয়ে আসার ছপ্ ছপ্ শব্দটা সে শুনতে পায় শুয়ে শুয়ে। প্যান্টের শপ্ শপানি স্পষ্ট হয়ে উঠলো, লোকটা কি এখানেই উঠছে? দরজার কাঁচ দিয়ে দেখা যাচ্ছে ঝাপ্ সা মানুষটাকে, ভিজে ভিজে জুতোর আর্তনাদ শোনা যাচ্ছে। মজার একটা কৌতূহল নিয়ে নলিনী তাকিয়ে রইলো দরজার দিকে।

কাঁচের ওপর আড়ষ্ট আঙুলের আওয়াজ হল, ঠুক্, ঠুক্, ঠুক্।

নলিনীকে উঠতে হল এবার লেপটা ছেড়ে। দরজাটা খুললো না, বিছানার ওপরই উঠে বসে জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে শুধালো, কৌন্?

ভাঙা হিন্দীতে জবাব এল, ইধার নলিনীবাবু রহতা হ্যায়?

স্বরটা চেনা চেনা, সুরটা নয়। নলিনী বললো, ঠাহরিয়ে।

লুঙ্গিটা ভালো করে এঁটে নিয়ে ওভারকোটটা গায়ে দিল তারপর লাইটটা জ্বালিয়ে দিয়ে দরজাটা খুললো নলিনী।

শীতার্ত মেঘলা দিনের থমথমে বিষণ্ণতা এক মুহূর্তে কেটে গেল।

নলিনী অবাক খুশিতে চেঁচিয়ে উঠলো, আরে তুই, তুই কোত্থেকে• আয় আয় ভেতরে আয়, এঃ ভিজে একেবারে—

দেবেশ বললো, যাক্ পেলাম তা হলে খুঁজে শেষ পর্যন্ত, সেই সাড়ে চারটে থেকে ঘুরছি। কে জানতো শীতকালে এত বৃষ্টি হয়।

নলিনী বললো, দিল্লীর ওই মজা, বর্ষাটা শীতে পুষিয়ে দেয়। জিনিস-পত্র নেই কিছু সঙ্গে?

বড় রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছে গাড়িটা, বললো, এত জলে আসবে না।

দাঁড়া আমি নিয়ে আসি, তুই আর কেন ভিজবি?

নলিনী বললো, খুব হয়েছে, থাম দেখি।

রেনকোট্‌টা টেনে নিয়ে বললো, চল বাক্স বিছানাটা তো বাঁচিয়ে আনতে হবে।

বাইরে বেরিয়ে টিপ্‌ টিপ্‌ বৃষ্টির মধ্যে জল ভেঙে এগিয়ে যেতে মন্দ লাগছে না এখন।

বিছানার মধ্যে বসে থেকে এত যে শীত করছিল এখন তো ততটা নেই। ওটা বুঝি মানসিক। ভয়ের মধ্যে এগিয়ে গেলে আর ভয় থাকে না। সেই বহুদিন আগের কথাটা মনে হচ্ছে। নবদ্বীপ থেকে ফুটবল খেলে ফিরছে ওরা। দেবেশ আর ও। মাঠটায় ঠিক এমনি জল হয়ে গিয়েছিল ওদের খেলা শেষ হওয়ার একটু পরেই। অন্য ছেলেরা সেদিন আর ফেরেনি বৃষ্টির ভয়ে।

সুটকেশ বেডি'টা নামিয়ে রেখে দেবেশ শুধালো, বৌদি কইরে? বাসায় আর কেউ নেই তো?

নলিনী বললো, কে আবার থাকবে, যা না ভিতরে। ও সব সাবলেটের ভেতর আমি নেই, সুখের চেয়ে স্বস্তি ভালো।

দেবেশ শেষের কথাটায় কান দিল কি দিল না, চেঁচিয়ে ডাক দিল, বৌদি, ও বৌদি?

রান্নাঘরে বসে চমকে উঠলো সুরমা, এমন করে তো এখানকার কেউ ডাকে না। আর স্বরটাও যে চেনা চেনা। কড়াটা নামিয়ে তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়ালো সুরমা, যেই হোক কাপড়টা বদলানো দরকার।

বার হতে গিয়েই মুখোমুখি হয়ে গেল। ঠিক সেই মুহূর্তে দরজা খুলে ভেতরের বারান্দায় এসে পড়েছে দেবেশ।

এই যে, বাঃ বেশ লোক, আধ ঘণ্টা হল এসেছি, চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে গলা চিরে গেল, পাত্তা নেই।

অপ্রস্তুত মুখে হাসি টেনে সুষমা বললো, ওমা আপনি কোত্থেকে? কখন? আমি বলি কে না কে।

চকিতে একবার কয়লা হলুদের ছাপ লাগা শাড়িটার দিকে তাকিয়ে নিল সুরমা।

দেবেশ চট্ করে নীচু হয়ে প্রণাম করে বসতে, সুরমা তিন পা পিছিয়ে গিয়ে বললো, ও আবার কি হচ্ছে ?

বাঃ বৌদি গুরুজন, আপনিই তো বলেছেন।

দেবেশের কথার ভঙ্গিতে সুরমার মুখে সত্যিই হাসি ফুটলো এবার।

—তা হলে আপনার দাদাকেও করুন।

হো হো করে হেসে উঠলো দেবেশ, ঈস, ওই বরং আমার থেকে ছ-মাসের ছোট।

নলিনী বললো, হ্যাঁরে থাকবি তো কিছুদিন ?

এলাম যখন দিল্লী, আগ্রাটা না দেখে কী আর ফিরবো। ও বৌদি, আপনার ছেলেরা কোথায় গেল—ঝণ্টু পিন্টু।

ওরা তো নেই এখানে, পড়াশুনা হয় না এখানে ভালো, তাও তিন মাইল দূরে স্কুল। পাঠিয়ে দিয়েছি গাঁয়ে ঠাকুরমার কাছে। ওসব কথা পরে হবে—কাপড় জামাগুলো ছাড়ুন তো দেখি। শীত করছে না ?

দেবেশ বলল, ড্রয়ার্স থেকে শুরু করে সোয়েটার কোট কিছুই বাদ নেই, ভেতরে পৌঁছতে এখনো ঘণ্টাখানেক লাগবে।

সুরমা বললো, তা হোক, নতুন জায়গা। চান করে ফেলুন বরং, ভেজার পর চান না করলে অসুখ করতে পারে।

দেবেশ স্নানের ঘরে গেলে সুরমা বললো, ছুটো মিষ্টি এনে দেবে, চা দেবো কি দিয়ে ?

নলিনী চট করে মুখটা তুলে ধরে বললো, রাগ পড়েছে মহারাণীর ? বাব্বা কী রাগ, সারাদিন কথাই বলোনি।

সুরমা বললো, আর নিজে ? সে সব ফয়শালা রাত্রে হবে, এখন তাড়াতাড়ি যাও তো, আর হ্যাঁ, লালাজীর দোকান থেকে আলু পেঁয়াজ এনো একসঙ্গে।

নলিনী বললো, কয়লা ? কয়লা আনতে হবে না ?

তোমার ভরসায় কী আর বসে আছি আমি এখনো ? কয়লা না

আনালে উনুন ধরালাম কী দিয়ে? তোমার আর কি, দরজা জানলা এঁটে শুয়ে আছ।

চার আনা পয়সা বের করে দিল সুরমা। নলিনী অবাক হয়ে বললো, ও, পয়সা লুকিয়ে রেখে আমাকে জ্বালান হচ্ছিল সকাল থেকে, অ্যাঁ? বটে কতো পয়সা দাও আমাকে যে লুকিয়ে রাখবো? সকাল বেলায় পুরনো কাগজগুলো বিক্রী করলাম না? এক টাকা পেয়েছিলাম, দশ সের কয়লা আনিয়েছি, এই চার আনা, আর দু-আনা আছে মোটে। কী দিয়ে যে খেতে দেব দেবেশবাবুকে জানি না। নিজেদেরই চলছে না, মাসের শেষে আবার—

নলিনী বললে, ছিঃ, কী বলছো রমা? কখনো তো আসে না।

সুরমা বললো, আহ্‌হা তাই বলছি নাকি। চাল আটা না হয় লালাজীর দোকান থেকে আনলে, হাতে কিচ্ছু নেই, ভদ্রলোককে আদর আপ্যায়ন—নলিনী বললো, নাও দেবুর সঙ্গে আর কুটুম্বিতা করতে হবে না। আমরা যা খাচ্ছি তাই খাবে।

সুরমা বললো, তাই কি হয়, এই তো প্রথম এল আমাদের এখানকার বাসায়। শোনো, তুমি চট্ করে যাও, আর দালদাও একটু নিয়ে এস। কাল সকালে চায়ের সঙ্গে দেবো কি। রাত্রেও না হয় লুচি ভেজে দেবো, মাছ তরকারী না থাকলেও চলে যাবে।

সুরমার ভরসা ছিল পরের দিন মাছওয়ালাটা আসবে, তার কাছ থেকে একদিন ধারে নিলেই চলবে। চেনা লোকটা কিন্তু এল না সেদিন, এমন কি পরের দিন, তারপর দিনও না। ভাগ্যিস্ সবজীওয়ালা এল সোমবার, আর কপি টম্যাটোর সময়, নইলে কী দিয়ে যে খেতে দিত সুরমা। লালাজীর দোকানের আলু পেঁয়াজ আর ডালের বড়া দিয়ে তো আর রোজ রোজ অতিথিকে ভাত দেওয়া যায় না। কিন্তু মঙ্গলবারও যখন মাছওয়ালাটা এলো না, সুরমা রেগে গিয়ে রাত্রে

বললো, কাল যেখান থেকে পাও হুটো টাকা অন্তত আনতেই হবে, এরকম করে রোজ রোজ নিরামিষ খাওয়ানো যায় মানুষকে। সবাই জানে মাছ মাংস সস্তা এখানে কলকাতার চেয়ে। তিন দিন ধরে শুধু আলু আর কপি।

নলিনী ইতিমধ্যে চেষ্টা করেছে। চিন্তিতভাবে বললো, আর হুটো দিন তো মোটে, পরশুই তো মাইনে পাচ্ছি।

সুরমা বললো, সে-ও রাতের আগে নয়। না বাপু আমার লজ্জা করে খেতে দেবার সময়, আর এদিকে রোজ লুচি ভেজে দেওয়া, খরচা হচ্ছে না। মাছমাংস আনলে ভাতরুটি যা হোক দেওয়া যায়।

একটু চুপ করে থেকে নলিনী বললো, তাহলে এক কাজ করি ; দেবুর কাছ থেকেই না হয় কটা টাকা নিয়ে নিই, কী বলো ?

সুষমা অবাক হয়ে বললো, তোমার কি মাথা খারাপ হয়েছে ? কী ভাববে ও।

তাই তো বলছি সবাই জানে মাসের শেষ, আর হু-তিনটে দিন যাক্ না। তারপর যত খুশি খাইও।

সুরমা রাগ করে বললো, কাল থেকে তুমি ভাত বেড়ে দিও, আমি পারবো না।

রাগ করলো বটে সুরমা, নলিনীর যুক্তিটাই কিন্তু মেনে নিল শেষ পর্যন্ত। পরদিন নলিনী আপিসে বেরিয়ে যেতে দেবেশকে দ্বিতীয়বার চা-দিতে গিয়ে সুরমা বললো, ঠাকুরপো আপনার কাছে গোটা পাঁচেক টাকা আছে খুচরো ? পাশের বাড়ির ভদ্রলোকের অসুখ, ওঁর বৌ চাইছিল—পরশু দিয়ে দেবে মাইনে পেলে।

দেবেশ চায়ের কাপটা মুখ থেকে নামিয়ে বললো, দিচ্ছি দাঁড়ান। পাঁচ টাকা খুচরো আছে কিনা—।

বুক পকেটটা দেখে বললো, খুচরো তো নেই বৌদি, ওই সুটকেসটায় আছে খামের মধ্যে—দেখুন দশ টাকার নোট আছে বোধ হয়।

নোটটা নিয়ে নিজেই বাজারে গেল সুরমা। এবেলায় আর হবে না,

ওবেলায় বরং রুটির সঙ্গে মাংস করাই ভালো মাছের চেয়ে। ঝোঁকের মাথায় সুরমা মাংসটা এক সেরই নিয়ে ফেললো, তবুও তো সাড়ে তিন টাকা হাতে থাকলো দু-দিনের।

বাকী পাঁচ টাকা ফেরত দিতে যেতে দেবেশ বললো, দশ টাকাই দিলেই পারতেন, অসুখ-বিসুখের বাড়ি, দরকার হতে পারে।

সুরমা বললো, দরকার হলে নিজেই নিত। ওই তো ফেরত দিয়ে গেল।

বিকেল বেলা দেবেশ বাড়ি ফিরলো না দেখে খুশিই হল সুরমা, রাতের জন্য লুচিই ভাজলো শেষ পর্যন্ত, বিকেলের জল খাবারের ওপর আর খান ছয়েক করলেই হয়ে যাবে। আর মাংসটা তো বেশীই আছে।

দেবেশ ফিরলো সেই ন-টায়। নলিনী বললো, কিরে এতো দেরি যে, গিয়েছিলি কোথায়?

দেবেশ বললো, আরে সীমন্ত এখানে কমার্স মিনিস্ট্রির আণ্ডার সেক্রেটারী বলিস্ নি তো তুই? হঠাৎ আপিসে দেখা হয়ে গেল। ধরে নিয়ে গেল বাড়িতে। হাঁরে, বললো তোর সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ হয় না। ক্লাসফ্রেণ্ড এক জায়গায় আছিস্ দেখা হয় না—ব্যাপারটা কি? মাইনের তফাৎ?

নলিনী বললো, কতকটা তাই বোধ হয়। দু-একবার গিয়েছিলাম ওর বাসায়, বুঝলাম ঠিক পছন্দ করে না, তারপর আর যাইনি।

সে কিরে, শুনেছিলাম বটে এখানে এই রকম, কিন্তু ক্লাসফ্রেণ্ড—?

চিন্তিতভাবে দেবেশ বললো, কিন্তু আমাকে তো খুব খাতির করলো, পরশু আবার ডিনারের নেমন্তন্ন করলো। কী বলিস্ রিফিউজ করে দিই?

নলিনী বললো, বাঃ যাবি না কেন, বলেছে যখন নিশ্চয়ই যাবি, তোর সঙ্গে তো কোন খারাপ ব্যবহার করেনি।

সুরমা সাড়া পেয়ে ঘরে ঢুকে বললো, কী এতো দেরি যে এদিকে সব জুড়িয়ে জল হয়ে গেল।
নলিনীকে আগে বলেনি সুরমা, খেতে বসে সে অবাক হয়ে মুখের দিকে তাকাতে সুরমা চোখের ইঙ্গিতে একটা খুশিভরা ধমক দিল শুধু।
দেবেশ বললো, ওরে বাবা, আজ যে একেবারে নেমতন্ন বাড়ি। এত মাংস কে খাবে ? আমি কি রাক্ষস নাকি।
সুরমা বললো, লুচি আর মাংসই তো শুধু। আর বিকেলে তো খানও নি কিছু।
দেবেশ বললো, খাইনি আবার, বেশ হেভি টিফিন হয়ে গেছে।
কোথায় আবার খেয়ে এলেন, বেশ লোক আপনি। আজই মাংস আনালাম, ওসব শুনছি না আমি একটুও। পড়ে থাকলে চলবে না বলে দিচ্ছি।
দেবেশ বললো, আগে থেকে নোটিশ দিতে হয়। আমি কিন্তু একটা নোটিশ দিয়ে রাখছি, পরশু রাত্রে খাবো না।
সুরমা বললে, পরশুর কথা পরশু, আজ কিন্তু পাতে কিছু ফেলে রাখতে দেবো না, আগে থেকে নোটিশ দিয়ে যাননি কেন।
দেবেশ বললো, তা মাংস কি আর শেষ করা যায় না। সবটাই খাবো কিন্তু একটা সর্তে।
কি ?
কাল সবাই মিলে বেড়াতে যেতে হবে, রেডফোর্ট, কুতুব, তুগলকাবাদ। সারাদিনের পোগ্রাম, বাড়িতে রান্নার ঝঞ্ঝাট করবেন না। পিক্‌নিক্ করা যাবে বেশ।
সুরমা বললো, ও বাবা, ওসব আমার দ্বারা হবে না। সারাদিন ওসব সাহেবী খানা খেয়ে আমার আমার চলবে না। যেতে হয় ভাত খেয়ে বেরোব।
দেবেশ বললো, নাঃ আপনি সেই ঘরকুনোই রয়ে গেলেন, আমরা

কোথায় ভাবছি দিল্লীওয়ালা বৌদি শালোয়ার পাঞ্জাবী চড়িয়ে হিন্দী উর্দু ফার্সী বুলি উড়িয়ে গোস্‌রোটি খেয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে কুতুব রেড-ফোর্ট, পার্লামেন্ট, তা নয় সেই শাড়ি জড়িয়ে রান্নাবান্না। সাধে কি আর বলেছে ঢেঁকি স্বর্গে গেলেও ধান ভানে।

নলিনী বললো, যা বলেছিস, একেবারে ঘরকুনো ঘরণী, নড়তে চায় না বাড়ি থেকে।

সুরমা ফোঁস করে উঠলো, ঈস্, কত যেন নিয়ে যাও আমাকে। বলো না আর—

দেবেশ বললো, থাক থাক, ওসব আর আমার সামনে কেন বৌদি ?

দেখুন না, নিয়ে যায় না কোথাও।

আবার নলিনী বললো, বেশ তো কাল যাও না দেবুর সঙ্গে। আমার তো হয়ে উঠবে না। তুই ওকে নিয়েই দেখে আয় বরং কাল। পিক্‌নিক্‌টা রবিবার হবে।

দেবেশ বললো, কেন, একটা দিন ছুটি নে না।

নলিনী বললো, নারে নতুন অফিসারটা বড় পাজী।

সুরমা বললো, তোমার আবার ভয় বেশী, সবাই তো কেমন ছুটি নেয়।

নলিনী বললো, অফিসারকে না চটানোই ভালো, ইনক্রিমেন্টের সময় আসছে, একটা খারাপ রিপোর্ট দিলেই দু-তিন বছর বন্ধ।

নলিনীকে টলানো গেল না। শেষ পর্যন্ত সুরমা আর দেবেশই গেল পরদিন, খাওয়া দাওয়া সেরে। ফেরার পথে দেবেশ বললো, কী নেওয়া যায় বলুন দেখি, বেশ সব্‌বার জন্য হবে ?

সুরমা বললো, কেন লতার জন্য কিছু নেবেন না ? সিল্কের শাড়ি আর জুতো সস্তা এখানে।

দেবেশ বললো, সে পরে হবে, এখন এমন একটি বেশ দিল্লীর জিনিস নিতে যেটা সবাই দেখবে, অনেকদিন থাকবে।

সুষমা বললো, তাহলে একটা তাজ নিন, আর লতার জন্যে হাতীর দাঁতের মালা।

দেবেশ বললো, আগ্রা যখন যাচ্ছি তাজটা কেন আর এখান থেকে নিই? ওই মালা দুটো আর হরপার্বতীটাই বরং নেওয়া যাক্।

পছন্দ করার পর পার্স থেকে টাকা বার করতে গিয়ে দেবেশ চমকে উঠলো, একি? একশো টাকার নোটটা গেল কোথায়? পকেটের কাগজপত্রগুলো বের করে দেখলো। না, নেই তো। যতদূর মনে পড়ে নোট্‌টা পকেটেই ছিল। পরশু দিন বিকেল বেলাতেই তো বের করে রেখেছিল পকেটে। আবার কি কাগজপত্রের সঙ্গে সুটকেশে রেখে দিয়ে এলো?

সুরমা বললো, কী হল, টাকা আনতে ভুলে গেছেন তো?

দেবেশ চিন্তিত মুখে হাসি টেনে বললো, তাই তো দেখছি। যাক্‌গে, পরে নেওয়া যাবে এখন, আছি তো এখনো চার-পাঁচ দিন।

বাড়ি ফিরেই সুটকেশটা খুলে ফেললো দেবেশ। টাকাটা না পাওয়া পর্যন্ত ভয় হচ্ছে তার, হারিয়ে গেল না তো।

দু-দুবার কাগজপত্র, সুটকেশের পকেটগুলো দেখলো দেবেশ। আশ্চর্য, কোথায় গেল টাকাটা? কালকের রাখা কাগজগুলো তো এই রয়েছে, কিন্তু টাকাটা উড়ে গেল নাকি। এবার জামা কাপড়গুলো তুলে' তুলে' এমন কি ভাঁজ খুলে দেখলো দেবেশ।

নেই!

একবার, দু-বার, তিনবার। শেষ পর্যন্ত প্যাণ্টকোটের পকেটে হাত ঢুকিয়েও দেখলো একটা মরিয়া আশা নিয়ে। নেই।

হাল ছেড়ে দিয়ে ক্লান্ত হয়ে বসে পড়লো দেবেশ। কলকাতা ফিরে যাওয়ার পুরো ভাড়াটাও তো নেই। পকেটে আছে গোটা বারো,

আর এই এখানে এই দশ টাকার নোটখানা শুধু, বৌদির কাছে দেওয়া আছে পাঁচ, তাহলেও তো সাতাশ টাকা মাত্র।

একশোটা টাকা হারিয়ে যাওয়া আশ্চর্য, অবিশ্বাস্য।

পকেট থেকে পড়ে যাবার কথাই ওঠে না, খুচরো টাকা পয়সা তো পার্সে'ই থাকে। পার্সে'র যে পকেট থেকে সে খুচরো টাকা খরচ করে সেখানে তো একশো টাকার নোটটা রাখেনি। কাগজপত্রের মধ্যেই রেখেছিল মনে হচ্ছে। হ্যাঁ, স্পষ্টই মনে হচ্ছে। তবে কি— যে কথাটা চকিতে মনের মধ্যে জেগে উঠেছিল, সেটা চাপা দেবার চেষ্টা করে দেবেশ। না না। এ নয়, এ হতে পারে না, একথা সে ভাবেনি, ভাবতে চায়নি, এটা সে বিশ্বাস করে না। আছে কোথাও, জামা কাপড়ের সঙ্গেই জড়িয়ে আছে কোথাও!

সুরমা বুঝি চা নিয়ে আসছে। জামা কাপড়গুলো আলগোছে তুলে রেখে ডালাটা বন্ধ করে ত্রস্ত হাতে একটা সিগারেট ধরায় দেবেশ। তার মনের কলুষ সন্দেহটা বুঝি পড়ে নেবে সুরমা বৌদি।

অগোছালো সুটকেশের দিকে তাকিয়ে সুরমা বলে, কী হল, পেয়েছেন তো!

হ্যাঁ, বলতে গিয়েও দেবেশের মুখ দিয়ে বেরিয়ে এল—না।

সে কি! কতো টাকা ছিল?

একশো টাকার একখানা নোট পাচ্ছি না। শুকনো গলায় দেবেশ বললো।

চা-টা নামিয়ে রেখে সুরমা শঙ্কিতস্বরে বললো, চলুন তো দেখি আমি একবার।

আছে কোথাও এখানেই, দেখছি আমি আর একবার ভালো করে।

দেবেশের গলায় হতাশ আতঙ্কের সুর ফুটে উঠেছে। সুরমা মুখের দিকে তাকিয়ে দেখলো যে কথাগুলো বললো দেবেশ তা সে বিশ্বাস করতে পারছে না।

সুরমা সাহস দিয়ে বললো, চা-টা খেয়ে নিন্, এখানেই আছে নিশ্চয়ই যদি রাস্তায় না পড়ে গিয়ে থাকে।

রাস্তায় তো পড়ার কথা নয় বৌদি। সুটকেশেই ছিল।

সুরমাও দেখলো, একবার ছু-বার তিনবার। শেষ পর্যন্ত সে-ও যখন হাল ছেড়ে দিল, দেবেশ করুণভাবে হেসে বললো, নেই বৌদি, থাকলে পাওয়া যেতো এতক্ষণ।

কিন্তু আপনি যে বলছেন, সুটকেশেই ছিল—তাই তো ভাবছি—

যে চিন্তাটা চাপা দেবার চেষ্টা করছে দেবেশ, সেটাই বার বার ভেসে উঠছে জলের ওপর এতটা তুরন্ত বলের মতন।

সুরমা বললো, আশ্চর্য তো। বাড়ি থেকে, বাক্স থেকে, কোথায় যাবে টাকাটা ?

দেবেশ যেন আপন মনেই বলছে, চোরের দয়া আছে বলতে হবে, এই বারোটা টাকাও নিতে পারতো, নেয়-নি, শুধু একশো টাকার নোটটাই নিয়েছে।

নলিনীর সাইকেলটা এসে বাইরে থামলো এই মুহূর্তে।

সুটকেশটা বন্ধ করে সুরমা কাঁপা গলায় বললো, দেখছি আমি, ছাড়া কাপড়ের সঙ্গে কোথাও পড়ে টড়ে গিয়ে থাকতে পারে।

আছে কোথাও, নিশ্চয়ই আছে, বাড়ি থেকে কোথাও যায়নি।—ঠাণ্ডা একটা হাসি হেসে আর একটা সিগারেট ধরালো দেবেশ।

রাত্রে সুরমা নলিনীকে বললো, কাল মাইনে আনার সময় একটা একশো টাকার নোট এনো তো।

ক্রসওয়ার্ডের একটা ক্লু ভাবছিল নলিনী, অন্যমনস্কভাবে বললো, হুঁ।

তারপর খেয়াল হতে বললো, কী বললে তুমি ? একশো টাকার নোট ? টাকা পয়সা জমাচ্ছো নাকি আজকাল ?

সুরমা ঠোঁট চেপে বললো, দরকার আছে।

স্বর শুনে চমকে উঠলো নলিনী। মুখটা টেনে নিয়ে বললো, একি, কাঁদছ তুমি? কী হয়েছে? এই?

সুরমা সত্যিই কেঁদে ফেললো এবার। স্বামীর কাছে কী লুকোবে সে? চোখ মুছে আস্তে আস্তে বললো বিকেলের ঘটনাটা।

স্তম্ভিত হয়ে নলিনী বললো. দেবু সন্দেহ করছে? তোমাকে?

কান্নাভেজা গলায় সুরমা বললো, জানি না। কিন্তু আমাদের বাড়ি থেকে টাকা চুরি যাবে এ অপবাদ আমি কিছুতেই সহ্য করবো না—

একটু চুপ করে থেকে নলিনী বললো, টাকাটা ফেরত দেবে ভাবছ, কিন্তু কেমন করে দেবে?

সুরমা বললো, সে যেমন করে হোক্ দেবো আমি। বলবো চৌকির তলায় পড়ে গিয়েছিল হয়তো কোট খোলার সময়।

একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে নলিনী বললো, চুরি না করেও চোরের সাজা নেবে? তারপর এক মাস চলবে কী করে?

সুরমা বললো, এখন তো দিয়ে দিই। পরে তুমি দু-গাছা চুড়ি বিক্রি করে দিও বরং।

নলিনী বললো, যা. ভালো বোঝো করো তুমি। কিন্তু আমার মনে হচ্ছে এ অন্যায়, চুরির চেয়েও অন্যায়।

সুরমা চুপ করে রইলো।

পরদিন সীমন্তর বাড়ি থেকে দেবেশ ফিরলো রাত দশটার পর।

দরজা খুলে দিয়েই সুরমা বললো, আপনার টাকাটা পাওয়া গেছে, দেবেশবাবু।

পাওয়া গেছে! সেকি? কোথায় পেলেন?

সুরমা ঘরে ঢুকে বললো, দুপুর বেলায় ঘর পরিষ্কার করছিলাম, চৌকিটা সরাতে গিয়ে দেখি জঞ্জালের সঙ্গে পড়ে রয়েছে।

নোটটা হাতে নিয়ে দেখে দেবেশ বললো, এ টাকা তো আমার নয়

বৌদি, এ তো নতুন নোট—আমার টাকাটা সীমন্তর বাড়িতে পড়ে গিয়েছিল, আজ ফেরত দিল।

ফেরত পাওয়া টাকাটা হাত বাড়িয়ে নেবার ক্ষমতাটুকুও হারিয়ে ফেলেছে সুরমা। চুরির চেয়েও অন্যায় কাজ করেছে সে।

দেবেশ যখন নীচু হয়ে প্রণাম করলো, কুণ্ঠিত গলায় বললো, আপনার কাছে আমার অপরাধের সীমা নেই বৌদি, তখনও সুরমা পিছিয়ে যেতে পারলো না প্রথম দিনের মতো। শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলো। হয়তো আজকের প্রণামটা তার প্রাপ্য বলেই, অথবা হয়তো অনুভব-শক্তিটা তার পাথরের মতো জমে গিয়েছিল।

সমান্তরাল

পা টিপে টিপে উঠে এলো প্রকাশ। ধীরে ধীরে পর্দাটা সরিয়ে উঁকি দিল। তারপর স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে ঘরে ঢুকলো। ফেরেনি এখনো।

দ্রুত হাতে ড্রেসিং গাউনটা পরে নিয়ে আর্মচেয়ারে গা এলিয়ে দিল তারপর। শান্তাকে মালকানির বাসায় পৌঁছে দিয়েই চলে এসেছে, পার্টিতে সে যায়নি। করবীর সঙ্গে দেখা হয়নি তার, সেই তিনটে থেকে বসে বসে অফিসের কাগজগুলো শেষ করছে।

কেমন লেগেছে তার করবীর সান্নিধ্য, দুটি ঘণ্টা কেমন করে কেটেছে অর্থহীন বিলাপ-প্রলাপে, সে কথা এখন আর মনে পড়ছে না। এতক্ষণ সে মনে মনে চেয়েছে শান্তা যেন এর মধ্যে না ফিরে থাকে, আবার ঠিক এই মুহূর্তে ধরা পড়ার আশঙ্কাটা কেটে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আর্মচেয়ারে বসে বসে অস্থির হয়ে উঠছে সে। কোথায় গেল মালকানি শান্তাকে নিয়ে? সিনেমা থেকে বড়োজোর 'এম্ব্যাসি' কি 'গে-লর্ড'। কিন্তু সে-ও তো ঘণ্টা দুয়েকের বেশি লাগার কথা নয়। তবে কি? না, শান্তা অত কাঁচা মেয়ে নয়।

তবুও, যদিও নিজে থেকেই সে প্ল্যান করে পাঠিয়েছে, অস্থির হয়ে উঠল প্রকাশ।

আরো একঘণ্টা পরে ফিরল শান্তা। প্রকাশের অস্থির আশঙ্কাটা তখন ব্যাকুলতা ছাড়িয়ে রাগের মুখোমুখি দাঁড়িয়েছে। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে একবার দেখে নিয়ে বলল, না ফিরলেই পারতে।

ঘা খেয়ে থামল না শান্তা। ঘুরে দাঁড়িয়ে সমান ব্যঙ্গে উত্তর দিল, সেকথাটা আমিও তোমাকে বলতে পারি।

চমকে উঠে প্রকাশ বলল, তার মানে ?

—তার মানে আমিও তোমাকে করবী মিত্রর সঙ্গে ঘুরতে দেখেছি।

কৈফিয়তের অপেক্ষা না করেই ওয়ার্ডরোবের দিকে চলে গেল শান্তা। মুখ নিচু করে নিভে-যাওয়া পাইপটা আর-একবার ধরাল প্রকাশ। মাথার ওপরে ফ্যানটা ঘুরছিল অদৃশ্যভাবে, তবুও গরম, অসহ্য গরম লাগছিল এতক্ষণ, এবার যেন হেমন্ত বাতাসে শীতের আভাস। ফ্যানটা বন্ধ করে দিয়ে আবার এসে বসল, তারপর আবার উঠল, পায়চারি করতে করতে মনে মনে বলল, তবে কি ওরাও ইণ্ডিয়া গেটে ঘুরছিল এতক্ষণ। এমন জেদী করবীটা, ইণ্ডিয়া গেটেই যেতে হবে !

শান্তা বলল, খেয়ে এসেছে সে। কে জানে ? তবু একা-একাই ডিনার টেবিলে বসতে হল প্রকাশকে, হয়তো শুধু হোটেলে খেয়ে আসেনি করবীর সঙ্গে, এটাই প্রমাণ করার জন্যে।

মিনিট কুড়ি পরে ঘরে এসে দেখল আলো নিভিয়ে শুয়ে পড়েছে শান্তা। এর মধ্যে যে ঘুমোয়নি সেকথাটা যে-কেউ বলে দিতে পারে। অন্ধকার ঘরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ সিগারেট টানল প্রকাশ, যদি কোনো সাড়া পাওয়া যায় শান্তার। তারপর কুণ্ঠিত অপ্রতিভ গলায় শুধোল, কী বলল মালকানি বললে না তো।

জবাব পেল না।

আর-একটু কাছে এসে খাটের ধার ঘেঁষে দাঁড়িয়ে বলল, শান্তা, লক্ষ্মীটি, শুনছ—

য়ুড ইউ প্লীজ্ লেট মি এলোন ? কঠিন কণ্ঠে জবাব এলো এবার। কৈফিয়ত চায়নি শান্তা, তারই দেবার কথা। কিন্তু দিল প্রকাশ। বলল, মিছিমিছি তুমি রাগ করছ শান্তা। কোনো ভদ্রমহিলা যদি বাড়িতে এসে বলেন, আমাকে একটু ঘুরিয়ে আনবেন, কী করতে

পারি বলো? বিশেষ করে মিস্টার মিত্র যখন গাড়িটা নিয়ে গেছেন বাইরে।

চুপ করে রয়েছে শান্তা। হয়তো বা নরম হচ্ছে মনটা। খাটের ধারে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাতটা খুঁজতে লাগল প্রকাশ অন্ধকারে।

—বিলীভ্ মি, লক্ষ্মীটি, কুড আই রিফিউজ হার? তুমিই বলো। মিসেস মিত্রকে হাতে রাখা ভালো নয়? মালকানি রেকমেণ্ড করবে বটে, কিন্তু ফাইন্যাল ডিসিশন তো মিত্রর হাতে।

হঠাৎ উঠে বসল শান্তা। —তার মানে আমাকে কি করবী মিত্রের স্বামীর কাছেও যেতে হবে? কী চাও তুমি?

গলার সুরে চমকে উঠল প্রকাশ।

—কী হয়েছে সু, মালকানি কি মিস্‌বিহেভ করেছে তোমার সঙ্গে?

এবার আর হাতটা সরিয়ে দিল না শান্তা, নিজে থেকেই ধরা দিল। মুখ লুকিয়ে কাঁপা চাপা গলায় বলল, কেন তুমি যেতে বললে আমাকে, রাস্কেলটার কাছে?

—কী হয়েছে সু?

যেটুকু বলল শান্তা তার থেকে বোঝা গেল, মালকানির ফ্যামিলি সম্প্রতি এখানে নেই, একলাই ছিল, নিয়ে গিয়েছিল ইণ্ডিয়া গেটে। ঘনিষ্ঠ হয়ে এসে হাতটা ধরেছিল শান্তার, আরো কী মনে ছিল কে জানে, পালিয়ে এসেছিল সে ট্যাক্সি ডেকে। তারপর কনট্ প্লেসে করবী আর প্রকাশকে একসঙ্গে পাশাপাশি মোটরে বসে যেতে দেখে রাগ করে মাননগরে গিয়ে বসেছিল এতক্ষণ সবিতাদের বাড়ি।

অভাবনীয় নয়, সন্দেহও হয়েছিল প্রকাশের। হয়তো, হয়তো কেন, ইচ্ছে করেই তো সে জেনেশুনে পাঠিয়েছিল শান্তাকে মালকানির ফাঁকা বাড়িতে। কী ছিল গোপনমনে নিজেও জানে না হয়তো। ভেবেছিল শান্তার একটু সান্নিধ্যের প্রতিদানে—সুন্দর মুখের অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করতে পারবে না মালকানি। হয়তো বা সে সময় মনের

গভীরে যুক্তি ছিল, —কী বা ক্ষতি শান্তার, প্রকাশের, যদি কয়েকটি ঘণ্টার গ্লানির পরিবর্তে সারা জীবনের গতি তাদের ফিরে যায়!

এই মুহূর্তে অন্ধকার রাত্রির রোমাঞ্চময় কান্নার বন্যাতরঙ্গে সেই গ্লানিময় যুক্তি-চিন্তাগুলি কিন্তু নিশ্চিহ্ন হয়ে ভেসে গেছে।

গভীর সমবেদনায় সান্ত্বনা দেয় শান্তার ক্ষুব্ধ রুষ্ট স্বামী, যে স্বামী তাকে একটি প্রোমোশনের জন্য একাকী স্ত্রী-বিরহী পুরুষের কাছে পৌঁছে দিয়ে এসেছিল।

গভীর গলায় শান্তা বলল, কাজ নেই তোমার প্রোমোশনে। চাকরি তো আর যাবে না। একটু হিসেব করে চললে কিসের অভাব আমাদের? দেখো তুমি, এবার থেকে আর টাকার জন্য বিরক্ত করব না তোমাকে।

শান্তার কান্নাভেজা মুখটি বুকের মধ্যে চেপে ধরে প্রকাশ বলল, জানলে কখনো পাঠাই তোমাকে? দেখে নিও তুমি সু, ওর ভাইপো আছে আমার আণ্ডারে, এর শোধ আমিও তুলব। আর কিছু না পারি, ইন্‌ক্রিমেণ্টটা তো আমার হাতে—

শান্তা বলল, থাক্‌গে ওসব কথা। রাত হয়েছে অনেক।

দেখা হ'তে মালকানি বলল, শী'জ এ নাইস গার্ল। আই এনভি ইউ, মিঃ রায়।

প্রকাশ হেসে ধন্যবাদ জানাল। তারপর বলল, আমার কেস্‌টা স্যার?

—ওহ্‌ হো, ডোণ্ট ওরি। আই'ল সেণ্ড ইট টুমরো। অমায়িক হেসে মালকানি প্রতিশ্রুতি দিল।

একমাস পরে খোঁজ নিয়ে জানল প্রকাশ, কিছুই করেনি মালকানি। করবার কাছ থেকে শুনতে পেল, ফাইলটা চেপে রেখেছে সে। মিঃ মিত্র বলেছেন, কই ওর কেস্‌ তো আসেনি এখনো।

তবুও এলো মালকানি একদিন নিজে থেকেই, ক্রিসেণ্ট পার্কের বাংলো থেকে প্রকাশদের কাকানগর কলোনিতে।
গুড্ ইভনিং জানিয়ে শান্তার হাতের কেক খেতে চাইল অমায়িকভাবে, রাত্রি দশটা পর্যন্ত গল্প করে গেল, শান্তার গান শুনল উচ্ছ্বসিত হয়ে, আর যাবার আগে নিমন্ত্রণ জানিয়ে গেল দুজনকেই।
এমন কি শান্তার ব্যবহারেও কোনো খুঁত ধরা গেল না। বরং এক-এক সময় মনে হল প্রকাশের, সে যেন খুশি করবারই চেষ্টা করছে।
খুশি হল প্রকাশ। আর কারো নাম পাঠাবার মতলব থাকলে নিজে থেকে আসত না মালকানি। ইঙ্গিতটা স্পষ্ট। ধীরে ধীরে পুরোনো যুক্তিগুলো মাথাচাড়া দিতে শুরু করছে আবার। কিন্তু সাহসও নেই। নিখুঁত ব্যবহার করেছে শান্তা, কিন্তু একথাও সত্যি যে খরচ কমাতে শুরু করেছে সে। সেদিনের পর থেকে অনেকগুলো পার্টি বাদ দিয়েছে। হয়তো বা মালকানিকে এড়াবার জন্য, হয়তো বা প্রকাশের প্রোমোশন না পাওয়ার অসম্মানটা গায়ে লেগেছে বলে, অথবা হয়তো প্রকাশের সমপদস্থ বন্ধুদের সঙ্গে পাল্লা দিতে পারছে না বলে।
এর জন্যে ঠাট্টাবিদ্রূপ শুনতে হয়েছে শান্তাকে ফোনে ফোনে। কেউ বা বাড়ি বয়ে এসে দেখিয়ে গেছে হ্যামিল্টনের গহনা অথবা পাঁচহাজার টাকার ফারকোট। মনে মনে জ্বালা ধরেছে শান্তার, বলতে পারেনি কিছু। সেও তো এতদিন এদেরই দলের একজন ছিল। প্রকাশের বারো শো টাকা মাইনেয়, তিনহাজারী আই. সি. এস. অথবা ধনী বা উপরিধন্য অফিসারদের সঙ্গে রেশারেশি করে সম্ভ্রম রক্ষা করেছে সে, আর সেকশন-অফিসার থেকে রুটিনগ্রেডে প্রোমোশন-পাওয়া আণ্ডার-সেক্রেটারির বৌটি যখন ঈর্ষাকাতর চোখে রেফ্রিজারেটারটার দাম শুধিয়েছে, করুণা অনুভব করেছে শান্তা।
আজ সেই সমাজলোভী বৌটি পর্যন্ত যখন নতুন কেনা (হয়তো ধারের টাকাতেই) গাড়িখানা দেখিয়ে গেল, সব প্রতিজ্ঞা উড়ে গেল শান্তার।

দাঁত কামড়ে পায়চারি করল কিছুক্ষণ, তারপর ফোনটা তুলে নিল। নতুন একটা ভালো গাড়ি চাই তার। পুরোনোটা কি বদলে নেওয়া যায় বাড়তি টাকা দিয়ে?—ওকে, নো, আই'ল কল অ্যাট ইওর শো-রুম! থ্যাঙ্কস্।

মোটা খরচের কথা শুনে চটে উঠল প্রকাশ। নতুন গাড়ি কেনার কথা সেও যে ভাবেনি তা নয়, কিন্তু প্রোমোশনটা না পেলে ম্যানেজ করবে কি করে? বিশেষ করে প্রস্তাবটা শান্তার কাছ থেকে আসাতেই যেন রাগ বেশি তার। শাড়ি-গহনা বা গৃহস্থালির গ্যাজেট হলে কথা ছিল। শান্তার ব্যাপার, তাছাড়া খরচও এমন বেশি নয়। কিন্তু নতুন গাড়ি, যার অর্থ হাজার ছয়েক ক্যাশ! হত, যদি—কিন্তু নিজেই তো বাধা দিয়েছে শান্তা।

বিদ্রূপের সুরে হেসে বলল, দুমাসে কত টাকা জমিয়েছ তুমি যে নতুন গাড়ির স্বপ্ন দেখছ?

শান্তার আজ নতুন চেহারা। কাছে ঘেঁষে এসে আবদারের ভঙ্গিতে বলল, না লক্ষ্মীটি, না বললে শুনব না। এই কথাটা রাখতেই হবে তোমাকে।

কালার বৌ নতুন 'ডি সোটো' চড়ে বেড়াবে আর তুমি চালাবে এই ঝরঝরে অস্টিন?

চা-টা নিজে হাতে ছেঁকে দিয়ে সোফার হাতলে বসল শান্তা।—তাছাড়া ক্যাশ তোমার কতই বা লাগছে এক্ষুনি, ইনস্টলমেণ্টে দিলেই চলবে। আর আমি কথা দিচ্ছি যতদিন তোমার মোটরের টাকা শোধ না হয় আমার হাত খরচ দিতে হবে না তোমাকে। আর কিছু চাই না। কেমন রাজী তো এবার?

একটু নরম হল প্রকাশ, অনেকখানি সমস্যা নিজেই মিটিয়ে দিয়েছে শান্তা, তাছাড়া নিজেরও কি কম শখ তার নতুন গাড়ির। বলল, তাহলেও তো হাজার দুয়েক অন্তত দিতে হবে এখন, সেটাই বা পাচ্ছি কোথায়?

অর্থাৎ রাজী হচ্ছে প্রকাশ। আদুরে ভঙ্গিতে ঘাড়টা দুলিয়ে শান্তা বলল, আ—হাঃ। দু হাজার টাকার জন্যে সব যেন আটকে যাবে। ব্যাঙ্ক থেকে তোলো না কিছু।

ব্যাঙ্কের টাকাটা যে করবীকে ধার দিয়েছে সে, কেমন করে বলবে প্রকাশ? আমতা আমতা করে, মাথাটা চুলকে বলল, ব্যাঙ্কে টাকা কই? দু-দুবার প্রিমিয়াম দেওয়া হল না? তারপর গাড়িটা সারাতে সেবার শ তিনেক গেল।

রাজী হয়েছে প্রকাশ, তাতেই খুশি শান্তা। খোঁজ করল না অত। বলল, বেশ তো, ইনসিওরেন্স পলিসি থেকে ধার নাও তাহলে। লক্ষ্মীটি সত্যি বলছি, নতুন একটা গাড়ি নইলে আর মান থাকছে না। তারপর হঠাৎ একটা মিথ্যা কথা বলল, জানো আমি পার্টিতে আজকাল যাই না কেন, শুধু তোমার ওই নড়বড়ে গাড়িটার জন্যে। শেষ পর্যন্ত কেনাই হল গাড়িটা এবং নতুন গাড়ির আনন্দে একদিন মালকানির বাংলো পর্যন্ত ঘুরে এলো শান্তা। আহা করুণাও হয় লোকটাকে দেখলে। এমন স্মার্ট সুপুরুষ চেহারা ভদ্রলোকের, অথচ বৌটা হয়েছে জুজুবুড়ী। সোসাইটিতে বের করবে কি? লুকিয়ে রাখবার মতো।

দুঃখ করে বলল মালকানি। কেন সে একজন সঙ্গী খোঁজে, কেন একা একা ড্রিঙ্ক করতে হয় বারে বসে। বিয়ারটুকু পর্যন্ত বাড়িতে আনার উপায় নেই বুড়ীটার জন্যে।

ঝকঝকে আলমারি ভরা বই দেখিয়ে বলল, দেখছ, এত বই, একজন আলোচনা করার লোক না থাকলে পড়তে ভালো লাগে কখনো? তুমি তো শিক্ষিতা, পড়াশুনা করেছ, তুমি বুঝবে। আমার মিসেস শুধু জানে রান্না আর সংসার। ভালো পড়তেই পারে না, বুঝবে কি?

মিসেস মালকানির উপর রাগ হচ্ছিল শান্তারও। সেই যে তখন একবার নমস্কার করে প্যান্ট্রিতে গিয়ে ঢুকেছে, আর পাত্তা নেই।

সাধারণ কথা, দু-চারটে ভদ্র আলাপও তো করতে পারত। ইংরেজি না জানুক, হিন্দী বলতে তো পারে।

কফি খেতে খেতে প্রকারান্তরে ক্ষমা চাইল মালকানি, সেদিনকার ঘটনার জন্য।

এর দিন পাঁচেক পরে যখন সত্যি সত্যই প্রকাশের প্রোমোশনের খবর পাওয়া গেল, মালকানির উদারতার প্রশংসা না করে পারল না শান্তা।

ইতিমধ্যে মালকানির পাশাপাশি প্রকাশের অগভীর মনের তুলনা করতে বসে হোঁচট খেয়েছে শান্তা। ইংরেজি-আমেরিকান বাজে ম্যাগাজিনগুলোর পাতা ওল্টানো ছাড়া আর কি পড়ে প্রকাশ? বড়োজোর এক-আধখানা ডিটেক্টিভ নভেল আর খবরের কাগজ, তাও বুঝি ওপর-ওপর চোখ বুলোয় চা খেতে খেতে।

তার পরে আয় বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে রাত্রে বাড়ি ফেরার সময়টা যখন তার ক্রমেই পিছিয়ে যেতে লাগল, ধীরে ধীরে কঠিন হতে শুরু করল শান্তা।

মাস চারেক পরে একদিন হঠাৎ আবার মালকানি এসে হাজির। সেদিনও প্রকাশ যথারীতি ফেরেনি তখনো। শুনে বলল, আয়াম সরি। ডিস্টার্বড্ ইউ?

তারপর নিজেই বলল আবার, থট্ আয়ুড ড্রপ ইন। হ্যাভ্ নট মেট হিম সিন্স হি লেফট আওয়ার অফিস।

সত্যিই তো, মালকানির একটু কৃতজ্ঞতাও কি পাওনা নেই? কি স্বার্থপর প্রকাশ, প্রোমোশনটা পাওয়ার পর একবার দেখা করা উচিত ছিল না তার! প্রকাশের হয়ে শান্তাই ক্ষমা চাইল, তারপর আপ্যায়ন করল একটু বেশি সহৃদয়তার সঙ্গে।

কথায় কথায় রাত হয়ে গেল। ঘড়ি দেখে মালকানি বলল, স্ট্রেঞ্জ,

হিঁজ নট কামিং ইয়েট। যতদূর জানি কোনো পার্টি তো আজ নেই। আর থাকলেই বা কি, তোমার মত স্ত্রীকে ফেলে—আই ওয়াণ্ডার! তারপর গলা নামিয়ে চরম অস্ত্র ছাড়ল—ইফ্ আয়াম নট ইনট্রুডিং টু-মাচ্—সেদিন একটি মেয়েকে দেখলাম—ওর সঙ্গে। নো, নো, ইট ওয়াজ্ণ্ট মিসেস মিত্র, আই নো হার ওয়েল। এটি আনম্যারেড এণ্ড ইয়ং, শী হ্যাজণ্ট ছাট ভারমিলিয়ন মার্ক। ওটাই তো আপনাদের বাঙালী মিসেসদের চিহ্ন। অ্যাম আই রাইট?

সে কথার উত্তর দিল না শান্তা। উত্তেজিত চাপা গলায় বলল, য়ুড্ ইউ মাইণ্ড টেকিং মি আউট, আয়াম হ্যাভিং হেল অব্ এ হেডএক্।

অবাক খুশি গলায় মালকানি বলল, শিওর, আই'ল বি অনলি টু গ্ল্যাড, ইউ নো। কিন্তু অনেক রাত হয়ে যায়নি কি?

কী যায় আসে। জেদ করে গেল শান্তা।

তবুও কিন্তু পারল না নিজেকে বিলিয়ে দিতে।

ফেরার পর প্রকাশের প্রশ্নের জবাব দেবার সময় শোধ তুলল—হ্যাঁ গিয়েছিলাম মালকানির সঙ্গে। একদিন তুমি নিজে পাঠিয়েছিলে, আজ আমি নিজে থেকেই গিয়েছিলাম। আর একটা প্রমোশনের ব্যবস্থা করে এলাম, খুশি?

শান্তার কাঁধটা ধরে একটা ঝাঁকানি দিয়ে প্রকাশ বললে, কী বলছ তুমি! আর ইউ ড্রাঙ্ক? এণ্ড ছাট্ স্কাইণ্ড্রেল—

পাল্টা আঘাত করল শান্তা মরিয়ার মতো। সে যদি স্কাইণ্ড্রেল হয়, তুমি কি? তুমি—কী না করেছ করবীর সঙ্গে? তারপর আবার নতুন একজনকে ধরেছ—

রাগে জিভটা জড়িয়ে গেল শান্তার।

থমকে দাঁড়াল প্রকাশ—হাউ সিলি! মাথা খারাপ হয়েছে তোমার—ওই ওল্ড হ্যাগার্ডটার সঙ্গে—হোয়াট অ্যান আইডিয়া! ফর ইওর ইনফর্মেশন, শান্তা, মিসেস মিত্রের সঙ্গে প্রেম আমি করিনি, প্রোমো-শনটার জন্য একটু খুশি রাখছিলাম।

অবিন্যস্ত কাপড়টা ঠিক করতে করতে ঘুরে দাঁড়াল শান্তা। তেমনি ব্যঙ্গ-তীক্ষ্ণ ভঙ্গিতে বলল, ওহ্, আর এই নতুনটি?

—নীতা? ওহ্‌হো, নিয়ে আসব একদিন। শী'জ স্টিল ইন হার টিনস—নীতা হল মিঃ মুখার্জির একমাত্র মেয়ে—হোপ আই হ্যাভ এক্‌সপ্লেনড ইট নাউ।

অবাক হল প্রকাশ। সব শোনার পরেও কিন্তু নিজের ব্যবহারের জন্য লজ্জিত হল না শান্তা, ক্ষমাও চাইল না।

ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে যেতে বলল, ইউ শুড্ বি অ্যাশেম্‌ড। সুপারিশের জোরে উন্নতি করতে চাও তুমি, কারো স্ত্রী, কারো মেয়ের সঙ্গে প্রেমের অভিনয় করে—অ্যাণ্ড হু নোজ ইফ্ ইট স্টপস দেয়ার—

প্রকাশ একটু চেঁচিয়েই বলল, আই ক্যান্ অ্যাশিওর ইউ অন্ ছাট পয়েণ্ট—

ডিনার টেবিলে বসে শান্তার চোখের দিকে তাকিয়ে বুঝতে পারল প্রকাশ, জেদের বশেই বলেছে সে কথাগুলো, এমন কিছুই হয়নি। পারবে না ও, শান্তার বিবেক বড়ো বেশি দুর্বল। ভালোই, খুশি হল প্রকাশ।

শান্ত হয়ে পাইপ ধরিয়ে বলল, কী ছেলেমানুষ তুমি সু, সুপারিশ না থাকলে শুধু মেরিটের জোরে এখানে যে কিছুই হয় না।

সেদিন বোঝেনি শান্তা, বুঝল বছরখানেক ওরে, চেম্‌স্‌ফোর্ড ক্লাবের রাত্রিটির পর।

অনভ্যাসের ফলে এক রাউণ্ড নাচের পরই হাঁপিয়ে পড়েছিল সে, পরম যত্নে উনবিংশ শতাব্দীর প্রথায় সেহ্‌গল নিয়ে গেল লাউঞ্জে। হোস্টেস শান্তা, আর গেস্ট সেহ্‌গল, এই তো রীতি।

না না করেও তুলে নিতে হল এক পেগ গিমলেট।

তারপর ক্লান্ত বিস্মিত চোখে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখল উনপঞ্চাশী লেডী সেহ্‌গলের যৌবনকল্প নাচ, আর প্রকাশের নিখুঁত অভিনয়। ড্রাই জিনের কয়েকটা পেগ শেষ করে মদিরা-চঞ্চল সেহ্‌গল আবার বলল, হাউ অ্যাবাউট অ্যানাদার রাউণ্ড ?

প্রত্যাখান করতে পারেনি, চুক্তি ছিল প্রকাশের সঙ্গে।

শেষ নাচের পর বাড়ি ফিরে বমি করে ফেলল শান্তা, স্নান করে শুচি হল।

কিন্তু রাগ করতে পারল না।

লেডী সেহ্‌গলের মন জুগিয়ে প্রকাশকে চলতে হয়েছে বলে বরং করুণা অনুভব করছিল ওপর। গভীর আশ্লেষে গলা জড়িয়ে মুখ লুকিয়ে বলল, এবার থেকে আর সন্দেহ করব না তোমাকে, কিন্তু—

—কী কিন্তু ?

—নাইবা চাইলে প্রোমোশন এমনি করে, নাইবা গেলে নিজেকে ছোট করতে ?

হো হো করে হেসে উঠল প্রকাশ।—ছোট ! ছোট মনে করলেই ছোট। সবার কাছে বড়ো হওয়ার জন্য হলামই বা একটু ছোট। সিলি গার্ল, আই লাভ ইউ ফর দিজ্ স্ক্রুপল্‌স।

তারপর অবাক স্তম্ভিত শান্তাকে হঠাৎ কাছে টেনে নিয়ে পিষে ফেলতে চাইল।

দিন পনেরো বাদে, সত্যিই ট্রান্সফারের খবর এলো, আর তার মাস তিনেক পরে একদিন উল্লসিত প্রকাশ এসে জানাল, জার্মানি যাচ্ছি অফিসের কাজে।

জার্মানি, ইউরোপ ! বার্লিন, রোম ! স্বপ্নসাধ। উচ্ছল হয়ে উঠল শান্তা। বলল, আমিও যাব, বহুদিনের শখ আমার।

তুমি ! হেসে উঠল প্রকাশ, হোয়াট্ অ্যান আইডিয়া ! কতো খরচ জানো ? তুমি কি মিনিস্টারের বৌ, না গুড্‌উইল ডেলিগেশনের মেম্বার যে সরকারী খরচে যাবে ?

তারপর শান্তার নিভে-যাওয়া মুখের দিকে তাকিয়ে বুঝি করুণা হল। বলল, তার চেয়ে এক কাজ করো না কেন? সিমলা বেড়িয়ে এসো বরং, সেহ্‌গলরা যাচ্ছে।
সিমলা! শ্রীনগর হলেও কথা ছিল। তাছাড়া সেহ্‌গলদের সঙ্গে? না, তার চেয়ে মার কাছ থেকে ঘুরে আসি বরং।

ফিরে এসে প্রতিশ্রুতি মতো বুইক কিনে দিয়েছে প্রকাশ, সোসাইটিতে সম্মান বেড়েছে শান্তার, ক্রিসেণ্ট পার্ক না হোক, পৃথ্বীরাজ রোডে বাংলো পেয়েছে সে। অল্পবয়সী অফিসাররা এখন তার কাছেই ঘোরাফেরা করে,—তবু কিন্তু সে খুশি হতে পারে না মনে মনে। কোথায় একটা অতৃপ্তি থেকে থেকে জ্বলা ধরায়।
সে কি পারবে স্থিতিশীল হয়ে এইখানে বসে থাকতে? তবে কেন প্যারী-ফেরত মিসেস সিন্‌হাকে ঈর্ষা করে সে, সামনের আসনটি না পেলে কেন খুঁতখুঁত করে?
ফাঁকিটাকে ফাঁকি বলে জেনেও সেটাকে এড়িয়ে চলতে পারে না। নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধেই চলেছে শান্তা প্রকাশের পাশাপাশি। কিন্তু কোনো দিন মিলবে না তারা।
কী বলে? সমান্তরালও নাকি মেলে অনন্তের কোলে? কে জানে অনন্তকাল তো আর তার জীবন নয়।
বিষন্ন দুপুরের ক্লান্তিতে আর অতন্দ্র রজনীর ঘুমভাঙা নির্জনতায় শিউরে উঠে ভাবে শান্তা।

সেদিন তখন দুপুর। ডেজার্টকুলারের শীকর-স্নিগ্ধ জড়তাটা দেহ থেকে ছড়িয়ে পড়েছে মন পর্যন্ত, এমনি সময় উঠে বসল শান্তা।

গাঢ় কালো পর্দাটা সরিয়ে উঁকি দিল মুমূর্ষু দুপুরটার দিকে। পাঁচটা বেজে গেছে, তবুও শ্রান্তি নেই নিদাঘ-দাহের।

ক্লান্ত অসন্তুষ্ট মনে ফিরে এলো শান্তা আবার বিছানার কাছে। আগে আগে বই পড়ত, এখন আস্তে আস্তে সব কিছু ভালো-লাগা হারিয়ে ফেলছে সে।

আরো একঘণ্টা অনায়াসে ঘুমিয়ে নিতে পারে সে। কিন্তু ঘুম তো নয় ফিনৃফিনে তন্দ্রার পর্দা ছিঁড়ে কুৎসিত বিভীষিকার কিলবিল উঁকিঝুঁকি।

কান্না পায় শান্তার এমনি সময়ে, ঠিক এই উদাসীন ক্লিষ্ট দুপুরে, যখন নয়া দিল্লীর পথে পথে নামে মন-কেমন-করা ঝিমুনি আর ওর মনে অবসর-ক্লান্ত শূন্যতা।

বেশ আছে প্রকাশ, সাড়ে নটা থেকে রাত বারোটা পর্যন্ত, অফিস, বার আর ক্লাব নিয়ে। মাঝে মাঝে ঈর্ষা করে শান্তা, মনে করে সে-ও ভেসে যায় এই অগভীর খরস্রোতে। ফিরে আসে, উৎপলাহত অতৃপ্তি নিয়ে।

হঠাৎ মোটরের হর্ন শুনে চমকে উঠল শান্তা। এখনও তো সময় হয়নি অরুণাংশুর। মনে আছে বৈকি রোশনারা ক্লাবে নিয়ে যাবে বলে জিদ ধরেছে। জানে না কি শান্তা কিসের গরজ ওর? নতুন অফিসার, প্রোমোশন চায় একটা, টাকার জন্যে নয়, সম্মানের জন্য। সবই জানে শান্তা।

কিন্তু সে তো সেই সাতটার পর সন্ধ্যার মুখোমুখি।

যে-ই হোক, নিঃসঙ্গতা থেকে মুক্তি তো। এগিয়ে গেল শান্তা দরজা খুলে। অরুণাংশুর নয়, প্রকাশের গাড়ি।

অবাক হয়েছিল শান্তা প্রকাশকে ফিরতে দেখে, শঙ্কিত হল মুখের দিকে তাকিয়ে।

প্রশ্নের প্রয়োজন হল না। নিজেই বলল প্রকাশ, অপমানের তিক্ততা আর আবেদনের আকুতিতে, পর্যুদস্ত হেরে-যাওয়া গলায়, কোনো কিছু না লুকিয়ে।

—ধরা পড়ে গেছি শান্তা। এবার বুঝি আর সামলাতে পারলাম না। শুনল শান্তা স্তব্ধ ঘৃণা নিয়ে। আশ্চর্য, তবু তারি মধ্যে একটা তৃপ্তি পায়, এ-ই যেন সে চেয়েছিল, প্রকাশের উন্নাসিক অগভীর জীবনদৃষ্টির এই পরিণতিই যেন সে মনে মনে কামনা করেছিল।

ভগ্ন, বিধ্বস্ত প্রকাশকে এই মুহূর্তে করুণা করতে শুরু করেছে শান্তা, অনেক যেন কাছাকাছি এবার। ভালোবাসা? না, ভালোবাসা নয়, সহানুভূতি।

শান্তার চোখের দিকে তাকিয়ে শেষে আকুতি জানাল প্রকাশ, তুমি একটা কিছু করবে না, সু?

—আমি? আমি কী করতে পারি বলো? ঠাণ্ডা গলায় কথাগুলো উড়িয়ে দিল শান্তা।

প্রকাশের নিভে-যাওয়া চোখে হঠাৎ বিদ্যুৎ জ্বলল—পারো, তুমিই পারো—পারতেই হবে তোমাকে, তুমি তো জানো মালকানিকে—কেসটা ওরই হাতে—

পারলে বুঝি শান্তা চোখের আগুনে পুড়িয়ে ফেলত প্রকাশকে, অন্যদিনের মতো আজও পারল না।

ঠিক এই মুহূর্তে মনে হল, তারপর?

পারবে না। এই স্বাচ্ছন্দ্যকলঙ্কিত জীবনকে ঘৃণা করেও সে ছেড়ে যেতে পারবে না।

শিউরে উঠল শান্তা, আর প্রকাশ শুনতে পেল দুটি শঙ্কাক্রান্ত অভয়বাণী: যাবো, চেষ্টা করব আমি।

একটি জীবন ঃ একটি দীর্ঘশ্বাস

পেপারওয়েট-চাপা হরনাথের শেষ চিঠিটা বাতাসে উড়ছিল। পাশেই টেলিগ্রামটা পড়ে রয়েছে। সারিবদ্ধ অক্ষরগুলো যেন প্রচ্ছন্ন এক অদ্ভুত বিদ্রূপে আমার দিকে তাকিয়ে আছে।

বিক্ষুব্ধ বিবেক বারবার মনের কপাটে ধাক্কা দিয়ে বলে উঠছে—তুমি, তুমিই একাজ করেছ, ওর এই পরিণতির জন্য তুমিই একমাত্র দায়ী, তুমি, তুমি, তুমি।

কিন্তু সত্যিই কী আমি এর জন্যে দায়ী?

মনে মনে নিজেকে জেরা করে ক্ষত বিক্ষত হয়েছি। আমি, হ্যাঁ আমিই তাকে সুইজারল্যাণ্ডে পাঠিয়েছিলাম: কিন্তু তার ভালোর জন্যেই তো একাজ আমি করেছিলাম। তবে তবে? কেন এরকম হ'ল?

হয়তো আমি ওর কাছে থাকলে অথবা ওকে ওখানে আরও কিছুদিন থাকবার অনুরোধ না করলে এ ঘটনা ঘটতো না। হয়তো ওকে এখানকার হাসপাতালেই সারিয়ে তোলা যেত। আমিই ওকে সুইজারল্যাণ্ড যেতে বলেছিলাম—কিন্তু এরকম কোন পরিসমাপ্তি আমি চিন্তাও করতে পারিনি।

বছরখানেক আগে শ্রীনগর থেকে ফেরার পথে হরনাথ আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল। জীবন আর জগৎ সম্পর্কে আমাদের দুজনের মতবাদে মিল না থাকলেও কলেজ জীবনে আমরা অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলাম।

বাবার মৃত্যুর পর অসুস্থ মায়ের ভার নিয়ে বিষয় সম্পত্তি দেখাশোনার জন্যে একান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও হরনাথকে বি, এ, পড়া ছাড়তে হয়েছিল। আমাদের যোগাযোগও এই সময় থেকেই ক্ষীণ হতে শুরু

করে। এর আগে ওর শেষ চিঠি আমি পেয়েছিলাম বোধহয় বছর দশেক আগে। ও লিখেছিল দেশের গ্রামেই থাকা স্থির করেছে। আমি তখন এম, এ, ফাইনালের জন্যে ব্যস্ত। আজ আর মনে পড়ে না ওর সে চিঠির আমি উত্তর দিয়েছিলাম কিনা। হয়তো দিইনি। কিন্তু পাশ করার পর দিল্লীতে চাকরি নিয়ে চলে আসার সময় আমি চিঠি দিয়েছিলাম একটা। ওকে আবার পড়াশোনা শুরু করবার কথা লিখেছিলাম। কিন্তু হরনাথ কোন জবাবই দেয়নি। তারপর থেকেই আমাদের যোগসূত্র ছিঁড়ে গিয়েছিল।

সত্যিই প্রথমে আমি ওকে চিনতেই পারিনি। ও কিন্তু আমার সম্বন্ধে সব খবরই যোগাড় করেছিল। চিনতেও ভুল করেনি। মুচকি হেসে জিজ্ঞেস করেছিল, কিরে চিনতে পারছিস?

অস্পষ্ট ছায়ার মত ক্ষীণ একটা চেতনা মনে এলেও তা এতই ক্ষীণ যে তাতে কোন সিদ্ধান্তে পৌঁছান সম্ভব ছিল না। কিন্তু ওর কথায়, আন্তরিকতার সুরে দ্বিধাগ্রস্ত ভাবে বলেছিলাম যে ওকে চিনেছি।

হরনাথ হঠাৎ সেই পুরোনো দিনের মতই প্রাণ খুলে হেসে উঠেছিলো, দশ বছরের বিস্মৃতিটাকে উড়িয়ে দিয়ে।

চীৎকার করে উঠেছিলাম, হরনাথ না? ওঃ কী ভীষণ পাল্টে গেছিস তুই! আম সত্যি একেবারেই........

ঃ আমি বুঝতে পেরেছিলাম তুই আমাকে চিনতে পারিসনি। আরে আমিও কী পারতাম নাকি? তোর অফিস থেকে আগেই সব খবর জোগাড় করে তবে এসেছি। প্রায় এক যুগ বাদে দেখা। কী বল!—হরনাথ সেদিন ঠিক এই কথাগুলোই বলেছিল।

হরনাথকে পেয়ে সত্যিই আমি আনন্দিত হয়েছিলাম। কর্মব্যস্ত এই দিল্লী সহরে বন্ধুবান্ধবহীন জীবনে কোন বৈচিত্র্যই ছিল না। উচ্ছ্বসিত হয়ে আমি ওকে প্রশ্নবাণে প্রায় আচ্ছন্ন করে ফেললাম।

ঃ তারপর আসছিস কোথা থেকে? আছিস কোথায় আজকাল?

নিশ্চয়ই তুই আমার এখানেই সোজা চলে আসছিস? কিচ্ছু চিন্তা নেই, আমি একাই আছি এখন। ঠিক নিজের ঘরের মত থাকতে পারবি। বহুদিন পরে আবার একসঙ্গে থাকা যাবে হোস্টেলের মত। হরনাথকে কিছুটা চিন্তিত মনে হ'ল। একটু যেন বিষণ্ণ ওর চাহনীটা। এর কারণ সেদিন সেই মুহূর্তে আমি বুঝতে পারিনি।

: তোকে কিছু ভাবতে হবে না অজিত। আমি মেরিনা হোটেলে বেশ ভালই আছি। দুচারদিনের জন্যে আবার সব লটবহর নিয়ে তোর এখানে আসার আর প্রয়োজন কী? তাছাড়া, তোর সময় থাকলে, আমি সবসময়ই তোর সঙ্গেই তো আছি। হরনাথের লৌকিকতায় বেশ কিছুটা বিস্মিত ও আহত হলাম।

আমি সিগারেটের প্যাকেটটা বার করতেই হরনাথ আগ্রহের সঙ্গে তাড়াতাড়ি একটা সিগারেট নিল কিন্তু দেশলাই জ্বালাতেই রেখে দিয়ে বলল,—ডাক্তারের কথামত আমি সিগারেট খাওয়া ছেড়ে দিয়েছি।—

মনে পড়ে গেল কলেজ জীবনে ও কোনদিন সিগারেট খায়নি, আমরা সাধ্যসাধনা করেও ওকে খাওয়াতে পারিনি। অবাক হয়েই জিজ্ঞেস করলাম, সিগারেট ধরলি কবে? সত্যিই ধরেছিলি নাকি?

: হ্যাঁ শুরু করেছিলাম বৈকি। শুধু সিগারেটই নয়, তোদের কাছেও আপত্তিকর এমন অনেক কিছুই পরীক্ষা করেছি, হয়তো তোদের থেকে কিছু বেশিই করেছি। জীবনটাকে রাতারাতি চিনতে গিয়ে অনেক বদলে গেছি, তাই না?—হরনাথ জোর করে গলায় দৃঢ়তা আনতে চেষ্টা করলে।

আধুনিক কেতায় কাঁধ ঝাঁকানো আর চোখের অস্বাভাবিক দীপ্তি সত্ত্বেও ওর স্পষ্ট স্বীকারোক্তিতে বিষাদের সুর অনুভব করলাম।

হরনাথ কী ধরনের গোঁড়া ছিল আমি জানতাম, তাই সব কিছুই অস্বাভাবিক মনে হ'ল।

কলেজে ভাল ছেলে হিসেবে বন্ধুমহলে ওর বদনাম ছিল। মজবুত চেহারা, আচার আচরণে নির্ভেজাল, পাঠ্য বই আর লেকচারে প্রবল আগ্রহ, পরীক্ষায় ভাল রেজাল্ট করার প্রচেষ্টা এবং সংস্কার-কুসংস্কারে প্রগাঢ় বিশ্বাস ইত্যাদি মিলিয়ে যা তৈরী করা যায় নিঃসন্দেহে তা-ই ছিল হরনাথ। ম্যাট্রিক পরীক্ষায় বৃত্তি পেয়েছিল কিন্তু সাধারণজ্ঞান ছিল ভীষণ কম। পাশ করার জন্যে যেটুকু পড়া দরকার তার বাইরে ও যেতে চাইত না। মনে পড়ে একদিন ও আমারকে জিজ্ঞাসা করেছিল চার্লি চ্যাপলিন কে রে? ভাল ফুটবল খেলোয়াড় বোধহয়, না? ওর এধরণের প্রশ্নের জন্যে আমরা ঠাট্টা করেছি; কিন্তু ও বলতো ঃ এসব জেনে লাভ কী হ'বে আমার? ওগুলো তো আর পরীক্ষায় আসবে না!

ওর স্বতন্ত্র চিন্তার পরিধি থেকে ওকে সরানো সম্ভব ছিল না। ভোর বেলা উঠে ব্যায়াম করতো, প্রাতঃরাশ সারত চিড়েমুড়ি আর ছোলাগুড়ে। সব রকমের খেলাধুলো, সিনেমা হোটেল আর আড্ডাকে ও চিরকাল বর্জনীয় বলে মনে করতো।

হরনাথ আত্মকেন্দ্রিক এবং স্বভাবে চাপা, তাই জনপ্রিয় ছিল না বন্ধুমহলে। ওর নিজের সংকীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে একমাত্র আমারই অনায়াস গতিবিধি ছিল। হরনাথ কোটটা খুলে ফেলার পর আমি বুঝতে পারলাম সত্যি ওর চেহারা বদলে গেছে।

খাটো করে পরা মোটা ধুতি আর রেডিমেড শার্ট ছাড়া যাকে কল্পনা করতে পারতাম না, তাকে সোনার ঘড়ি আর সার্কস্কিনের স্যুট পরতে দেখে যতটা অবাক হয়েছিলাম তার থেকে অনেক বেশী অবাক হলাম ওর চেহারার পরিবর্তন দেখে। লক্ষ্য করলাম ওর সুন্দর পেশীবহুল সেই মজবুত চেহারা আর নেই। মেদ আর চর্বিতে শিথিল।

হরনাথ একটু শুকনো হেসে বলল—বেশ মোটা লাগছে আমাকে, না? এর জন্যে বিজ্ঞান, ওষুধ-পথ্য আর বিশ্রামকে ধন্যবাদ জানাতে পারিস তুই। তোকে তো আগেই বলেছি দিনগুলো এখন আমার বেশ

নির্ঝঞ্ঝাটেই কাটে।—আবার জোর করে হাসতে চেষ্টা করেছিল হরনাথ।

ওর এই জোর করে হাসা ব্যঙ্গের মতই মনে হয়েছিল আমার। আমি অধৈর্য হয়ে বলে উঠলাম—দোহাই হরনাথ তোর এই ভনিতা এখন বন্ধ রাখ। কী হয়েছে তোর? সব ব্যাপারটা খুলে…

আমাকে শেষ করতে না দিয়েই যেন চাপা গলায় হরনাথ বলে উঠলো—সবই বলবো তোকে। ঠিক সেই কারণেই তোকে খুঁজে বার করেছি। প্রায় সব সময়ই তোর কথা মনে পড়েছে। কিন্তু আমার এই ব্যক্তিগত সমস্যা তোর ওপর চাপিয়ে তোকে অশান্তিতে ফেলতে চাইনি।

আগাগোড়াই ওর কথার মধ্যে একটা করুণ সুর আমাকে বিস্মিত করছিল। আমি কিছু বলার আগেই ও বললো—সত্যি বলতে কী অজিত, আমি তোর কাছে বিদায় নিতে এসেছি! আমাদের বোধহয় আর কোনদিন দেখা হবে না।

যে রকম হঠাৎ সুরু করেছিল তেমনি হঠাৎ চুপ ক'রে গেল হরনাথ। চাকরটা চা আর জলখাবার দিয়ে গেল। হরনাথ বেশ কিছুটা ইতস্ততঃ করে বললো, তোর এখানে এগুলো না খেলেই ভাল করতাম, কিন্তু না খেলে তুই হয়তো দুঃখ পাবি।

হরনাথ এসেছে প্রায় আধঘণ্টা হবে। কিন্তু এখনও নিজে একটা কথাও বলেনি। চা-টা ঠাণ্ডা হয়ে আসছিল; ও নিজের থেকে নেবে না দেখে আমিই ওকে এগিয়ে দিলাম।

হরনাথ নিঃশব্দে খাবার খেল। কিন্তু ওর কাপ ডিসটা সরাতে যেতেই ও প্রায় চীৎকার করে উঠলো: ওগুলো এখানেই থাক অজিত। তুই ওগুলোয় হাত দিস না। আমি একজন টি, বি, পেসেণ্ট!

ওর এই অস্বাভাবিক গলার স্বরে যতটা অবাক হলাম তার থেকে অনেক বেশী অবাক হলাম কথাটা এইভাবে আচমকা বলাতে।

: টি বি! কিন্তু তোকে তো দেখে মনে হয় না…

: তা হয়তো হবে। ওষুধপথ্য আর শ্রীনগরের স্বাস্থ্যকর পরিবেশের জন্যেই বোধহয়।—একটু রূঢ় হয়ে পড়েছে ভেবেই হরনাথ নরম করে হাসতে চেষ্টা করলো। তারপর হতাশ হয়েই বলে উঠলো: কিন্তু আমি কী করতে পারি বল, এ রোগ সারে না। সামনের এক বছরের মধ্যে যে কোন মুহূর্তে আমি এই লোকারণ্য থেকে হারিয়ে যেতে পারি।

: কিন্তু এ রোগে এখন তো সবাই সেরে উঠছে। তাছাড়া তুই যখন ঘুরে ফিরে বেড়াতে পারছিস তখন তুই তো অনেকটা সেরেই গেছিস। কতদিন থেকে রোগটা ধরেছে তোকে?—আমি ওর কথায় আপত্তি জানিয়ে সান্ত্বনা দিয়েছিলাম।

আমার দিকে না তাকিয়ে ও জবাব দিল: তুবছর আগে। প্রায় ছ'মাস বিছানায় শুয়ে থাকতে হয়েছিল। সে যে কী অসহ্য যন্ত্রণা তা তোকে বোঝাতে পারবো না। তোর কাছে আর কোন কথা গোপন করে লাভ নেই; তুই-ই বল আর একটা বছর যখন এ পৃথিবীতে আছি তখন আর ডাক্তারী নিয়ম কানুন মেনে কী হবে? —এ জীবনটাকে উপভোগ করতে চেয়েছিলাম, জানতে চেয়ে ছিলাম সব কিছু।

ঠিক এই কথাটাই ওকে, বোঝাতে চেষ্টা করেছিলাম আমরা যখন ওর স্বাস্থ, যৌবন সব কিছুই ছিল। সেদিন কিন্তু কী অদ্ভুত অর্থহীন লাগল কথাটা ওর নিজের মুখে।

আমি বিরক্ত হয়েই বললাম: পাগলামি করিস না, হরনাথ। যে ডাক্তার তোকে একথা বলেছে সে বর্তমান চিকিৎসা বিজ্ঞানের আবিষ্কারের কথা কিছুই জানে না।

হরনাথ উত্তেজিত হয়ে বলে উঠলো: চিকিৎসা বিজ্ঞানের প্রগতির কথা আমার সব জানা আছে। ভাগ্য পাল্টাতে পারে তারা? পারে মরা মানুষকে জীবন দিতে? —চট করে ভীষণ উত্তেজিত হয়ে ও পরমুহূর্তেই ঝিমিয়ে পড়ল। মুখে চোখে একটা তীব্র

যন্ত্রণার ছাপ পড়লো হরনাথের। আমি ভয় পেয়ে গেলাম। বোধহয় স্ট্রোক শুরু হয়ে গেছে।

কিন্তু না, এটা ওর উত্তেজনার জন্যে। ও নিজেই সামলে নিল। একটু লজ্জিত হয়েই বলল : হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে উঠেছিলাম আমি, দুঃখিত। ডাক্তারের উপদেশ মত এটাও আমার পক্ষে মারাত্মক। সামান্য একটু অনাচারে আমি অসুস্থ হ'য়ে পড়তে পারি। এগুলোই চিহ্ন তার—চিকিৎসাশাস্ত্র মতে পূর্বাভাষ বলতে পারিস।

এক ঝলক বিদ্যুতের মতই এক মুহূর্তেই আমার মনে পড়ে গেল, হরনাথের মা যখন ওর বিয়ের জন্যে চেষ্টা করছিলেন সে সময়ে ওর কোষ্ঠীর কথা আমায় বলেছিল একদিন। তখন আমি সেটার উপর কোন গুরুত্ব দিইনি। ভাবতেও পারিনি ও সেই ধারণাটাই পোষণ করবে এতদিন ধরে। কিন্তু দেখলাম সেই অনিশ্চিত ভাগ্য-লিপিটাকেই অভ্রান্ত বলে ভেবে রেখেছে। অবশ্য এরকম মারাত্মক রোগে যে ভুগছে তার পক্ষে ভাগ্যলিপিটাকে অভ্রান্ত বলে ভাবা স্বাভাবিক হয়তো।

ও সেরে যাবে, এ বিশ্বাসটা ওর মধ্যে ফিরিয়ে আনার জন্যে আমি তর্ক শুরু করে দিলাম : কিন্তু হরনাথ, এটা তুই ভুলে যাচ্ছিস কেন যে জ্যোতিষশাস্ত্রের যখন জন্ম হয়েছিল তখন এ, পি ; পি, এ, এস-স্ট্রেপটোমাইসিনের কথা কেউ স্বপ্নেও ভাবতে পারতো না। জানিস আজকাল ওইসব ব্যবস্থাতে…

: তোর থেকে এগুলোর সম্বন্ধে আমি বেশিই জানি অজিত! ওগুলোর কার্যপ্রণালী সম্বন্ধেও তোকে ছোটখাট একটা বক্তৃতা শুনিয়ে দিতে পারি। আজ পর্যন্ত এমন কোন ওষুধের অবিষ্কার হয়নি যাতে টি, বি-র বীজাণুকে ধ্বংস করা যায়। সেরে উঠে অনেকেরই আবার অসুস্থ হওয়ার বহু নজির আছে।

: কিন্তু অপারেশন? অপারেশনে আজকাল বহু পেসেন্ট সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠছে।

ঃ সেটা ঠিক। কিন্তু কজন এমন ডাক্তার আছে বল, যারা গ্যারান্টি দিতে পারে?

আমি এবার যেন একটু আলো দেখতে পেলাম। ভাবলাম ওকে যদি বোঝাতে পারি নির্ভরযোগ্য ডাক্তার আছে তাহলে ও হয়তো সেরে ওঠার আর একটা চেষ্টা অন্তত করবে।

কিন্তু যতই ওকে বোঝাতে চেষ্টা করি হরনাথের সেই এক কথা: বিজ্ঞান অনেক কিছুই করেছে স্বীকার করি, কিন্তু আমার ভাগ্যকে পাল্টে দেবে একথা আমি বিশ্বাস করি না। তাছাড়া আমার বরাতে দুটোরই অদ্ভুত যোগাযোগ। এক সময়ে আমিও এই ভাগ্যলিপির নিশ্চয়তা সম্বন্ধে সন্দেহ করতে শুরু করেছিলাম। ভেবেছিলাম হয়তো বিজ্ঞানের হাতে ভাগ্যের পরাজয় হ'তে পারে।

একটু থেমে একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেলে ও বললো: কিন্তু ভাগ্য বোধহয় অলক্ষ্যে হেসেছিল—ছ'মাসের মধ্যে তা বুঝতে পারলাম।

এরপর হরনাথ তার জীবনের অতীত অধ্যায়গুলো আমার সামনে মেলে ধরলো।

কেমন করে সেই অজ গ্রাম্য জীবনে ওর বিতৃষ্ণা আসে আর তার হাত থেকে অব্যাহতি পাওয়ার জন্যে পড়াশোনায় মন দেয়। নাগালের মধ্যে যে বই পেয়েছে পড়েছে—জ্যোতিষ থেকে শুরু করে নৃতত্ত্ব, যৌনবিজ্ঞান, সমাজনীতি সব কিছুই। নতুন নতুন চিন্তাধারার সঙ্গে সঙ্গে নিজের জীবনের ভবিষ্যৎ বাণীটার কোন বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নেই একথা মনের সঙ্গে তর্ক করে নিজেই বিশ্বাস করতে চেষ্টা করেছে। প্রশ্ন করেছে নিজেকে: যদি একটা নির্দিষ্ট নির্ধারিত সময়ে জীবনের সমাপ্তি হবে তবে উপভোগের এত বিচিত্র আয়োজন উপেক্ষা করে আড়ম্বরহীন এই সরল সংক্ষিপ্ত জীবনের সার্থকতা কী?

ঃ আমি আবিষ্কার করলাম পরীক্ষায় ভাল ফল করে শুধুমাত্র নিজেকে মেধাবী ছাত্র প্রতিপন্ন করে তোলবার অন্ধ প্রচেষ্টায় আমি জীবনের

সব থেকে ভাল সময়টাই অপচয় করে ফেলেছি। তুই তো জানতিস অজিত, জীবন যাপনের জন্যে আমার চাকরি করার প্রয়োজন ছিল না। মা মারা যাবার পর আমার কোন দায়িত্ব ছিল না। সমস্ত সম্পত্তি বিক্রী করে কলকাতায় চলে এলাম। টেনে আনলাম জীবনটাকে প্রাচুর্যের মধ্যে। ছুটো সম্ভাবনার কথা সেদিন চিন্তা করেছিলাম : যদি বেঁচে যাই আমার নির্ধারিত পরমায়ুর পরেও তবুও এখন জীবনটাকে জানতে হ'বে। কারণ ভাগ্য-লিখনটাকে মেনে নিয়ে জীবনের সব পাওনা থেকে নিজেকে বঞ্চিত করে বোকামি করেছি। আর ভাগ্য যদি অপরিবর্তনীয় হয় তবে এই অল্প যে কটা দিন বেঁচে আছি সে কটা দিন আমার সামনে বিস্তৃত এই মোহময় পৃথিবীকে দেখে নিতে ক্ষতি কী?

উদাস স্বরে হরনাথ বললো : আজ আর বলা সম্ভব নয়, কেমন করে আমি/আসন্ন বিভীষিকাকে কাটিয়ে তোলার জন্য আনন্দের নেশায় মাতাল হয়ে উঠেছিলাম···

তারপর আমার শরীর ভেঙ্গে পড়তে শুরু করলো। প্রথমে আমল দিইনি—উপেক্ষা বলতে পারিস। ডাক্তারের কাছে হাজির হ'লাম যখন, তখন আর দাঁড়িয়ে থাকার শক্তিটুকুও ছিল না।

সচেষ্ট সাহসিকতার এক করুণ অধ্যায়কে করুণতর করে তোলার পর হরনাথ সে রাতের মত বিদায় নিয়েছিল পরের দিন মধ্যাহ্নভোজনে আসবার স্বীকৃতি দিয়ে।

পরের দিন সকালে হরনাথকে আমি বোঝাতে চেষ্টা করেছিলাম তার অনিয়মের ফলেই আজকের এই পরিণতি, দৈবের প্রচ্ছন্ন নির্দেশ নয় বাস্তব অনাচারই এর জন্য দায়ী। বলেছিলাম এভাবে ভাগ্যের কাছে পরাজয় স্বীকার করে জীবনের এই পরিণতি মেনে নেওয়ার কোন সার্থকতা নেই।

হরনাথ শুধুমাত্র বলেছিল : অনুশোচনা আমার নেই—আমি শেষ দিনের জন্যে সম্পূর্ণ প্রস্তুত হয়েই রয়েছি।

বহু চেষ্টার পর ওকে রাজী করিয়েছিলাম সুইজারল্যাণ্ডের Lausanne হাসপাতালে লাংস্ অপারেশনে।
: বেশ তাই হবে। হরনাথ সর্ত রেখে সম্মতি জানাল। অপারেশন আমি করাতে পারি তবে বত্রিশ বছর পূর্ণ হবার আগে নয়। না, তার আগে কোন ঝুঁকি নিতে আমি রাজী নই। অন্ততঃ অপারেশন করার আগে আমি একবার দেখতে চাই এ ভাগ্যলিপি সত্যি কিনা!

ওকে রাজী করাতে পেরে আমি নিজেও আনন্দিত হলাম। ভেবেছিলাম ওকে এখানকারই কোন স্যানাটোরিয়ামে থাকার কথা বলব—কারণ Lausanne-এর খরচ অনেক বেশী। কিন্তু দেখলাম সুইজারল্যাণ্ড ভ্রমণের সুযোগটাও ওর রাজী হওয়ার অন্যতম পরোক্ষ কারণ।

মাসখানেকের মধ্যে হরনাথ সুইজারল্যাণ্ড পাড়ি দিল। শুধু আশা নয়, আমি বিশ্বাস করেছিলাম ও সুস্থ হয়ে ফিরে আসবে।

প্রথম তিন মাস চিঠির আদান প্রদান নিয়মিতই ছিল। বিদেশে জীবন ওর সুখেই কেটে যাচ্ছিল। তারপর সময়ের দৈর্ঘ্যের সঙ্গে তাল রেখে হরনাথের চিঠি ক্রমশঃ ছোট হয়ে আসতে লাগলো। শেষে অপারেশনের তারিখ যত এগিয়ে আসতে থাকে ওর চিঠিও দুতিন লাইনের লৌকিকতায় এসে পৌঁছয়। তারপর তাও শেষ হ'ল। তিনদিন ওর কোন খবরই পেলাম না। দুশ্চিন্তায় পড়লাম ওর টাকা শেষ হয়ে গেছে ভেবে। পরপর দুটো চিঠি পাঠালাম কেমন আছে, টাকা চাই কিনা জানতে চেয়ে। কিন্তু ও নিরুত্তর। একটা টেলীগ্রাম করেও জবাব না পেয়ে আমি বেশ মুষড়ে পড়লাম। নিজেকে অপরাধী মনে হ'তে লাগল। তবে কী—?

ঠিক এই সময়ে হরনাথের প্রতীক্ষিত চিঠি এল।

প্রিয় অজিত,

আমার আরোগ্য লাভের জন্যে আজ সকলকেই আমার

কৃতজ্ঞতা জানাই, বিশেষ করে তোকে এবং ডাক্তারদের। ওরা বলে আমি এখন সম্পূর্ণ সুস্থ। আর মাত্র ছ'মাসের বিশ্রামের পর আমি আবার স্বাভাবিক জীবনে ফিরে যেতে পারবো।

অনেকগুলো লাইন কেটে দিয়ে আবার পরে লিখেছে: স্বাভাবিক জীবন যাপনের উপযুক্ত আমি। কিন্তু বলতে পারিস আজ কী করে তা সম্ভব? কী করে আমি আরও ছ'মাস বিশ্রাম করবো? আর তার পর? আমার এই বত্রিশ বছরের অনভিজ্ঞতার পর কে আমায় চাকরি দেবে?

স্বাস্থ্যের খাতিরে এখন উপযুক্ত পথ্য এবং বিশ্রামের প্রয়োজন, কিন্তু কেমন করে তা সম্ভব? বিজ্ঞান তার দায়িত্ব শেষ করেছে। প্রচুর খরচ হলেও আমি সেরে উঠেছি। কিন্তু বাকীটুকু কে সম্পন্ন করবে? সমাজ কী আমার মত একটা পরগাছার ভার বহন করবে? আমার পক্ষে এতটা দাবী করা বোধ হয় অন্যায়।

যাই হোক টাকা পয়সার জন্যে কোন চিন্তা তোকে করতে হবে না। অপারেশনের বিল মেটাবার মত যথেষ্ট অর্থ এখনও আছে। কিন্তু ছাড়া পাবার পর?

আমি অবাক হই আর শুধু ভাবি।

একান্তই তোর—হরনাথ।

আমি আনন্দে দিশেহারা হয়ে গেলাম। হরনাথ তাহ'লে সেরে উঠেছে! আবার সুস্থ সবল জীবনের ভীড়ে হরনাথ তাহলে ফিরে আসতে পেরেছে।

আরও ছ'মাস ওখানে থাকার জন্যে ওর টাকার প্রয়োজন হবে জেনে আমি তখনই একমাস থাকবার মত টাকা যোগাড় ক'রে পাঠিয়ে দিলাম। ওখানেই থাকার উপদেশ দিয়ে জানিয়ে দিলাম মাসে মাসে স্যানাটোরিয়ামের বিলটা আমিই পাঠিয়ে দেবো। একথাও জানালাম ও এলে ওকে কোন একটা ভাল চাকরিতে ঢুকিয়ে দেওয়ার কোন অসুবিধে হবে না।

দিন পনেরো বাদেই জবাব পেলাম। হরনাথ লিখেছে :

বন্ধুবর আজত,

কৃতজ্ঞতা জানাবার ভাষা নেই। অত্যন্ত প্রয়োজনের সময়ে তোর টাকা এসেছিল। কিন্তু অত টাকার প্রয়োজন ছিল না। তোর কষ্টার্জিত টাকা এভাবে নষ্ট করার কোন মানে হয় না। তুই বিবাহিত, সন্তান পালনের দায়িত্ব রয়েছে। প্রয়োজনের বেশী টাকাটা ফেরৎ পাঠালাম—দোহাই তোকে, কিছু মনে করিস না।

ভাগ্যলিপি মিথ্যে হয়ে গেছে। পুরো বত্রিশ বছর পরেও একমাস আমি কাটিয়ে দিয়েছি। এখনও বে'চে রয়েছি ভবিতব্যকে মিথ্যে প্রতিপন্ন করে—পরাজিত করে। কী যে এক অদ্ভুত আনন্দ এ তা কী করে জানাবো।

বিদায় বন্ধু, বিদায়,
তোরই হরনাথ।

হরনাথের চিঠিতে ওর ভবিষ্যতের কোন পরিকল্পনার কথা লেখা নেই। ফিরে আসার টাকাই বা ও জোগাড় করবে কী করে?

সেদিন বিকেলের ডাকেই আশ্চর্যজনক বার্তা নিয়ে টেলীগ্রামটা এল :

"Lausanne-এর পুলিশ হাসপাতালের লেকে হরনাথের মৃতদেহ পাওয়া গিয়েছে।"

সংক্ষেপে আরও একটু সংবাদ এনেছে টেলীগ্রামটা।

"আত্মহত্যার চেষ্টায় বিষপান করার জন্যে তাকে গ্রেপ্তার করে বিচারের জন্যে চালান দেওয়া হয়।"

হরনাথের আগের চিঠিটা বার করে আর একবার পড়তে শুরু করলাম :

সমাজ কী আমার মত একটা পরগাছার ভার বহন করবে? আমার পক্ষে এতটা দাবী করা বোধহয় অন্যায়।

মূর্খ হরনাথ! তুই এতই দুর্বল আর স্বার্থপর ভাবিস সমাজকে। —আমি ভেঙ্গে পড়লাম। একবারও তুই ভেবে দেখলি না যে ভাগ্যকে পরাজিত করার পরও তুই তারই হাতের ক্রীড়নক রয়ে গেলি।

হরনাথের কাহিনী কিন্তু এখানেও শেষ হ'ল না।

ওর নিকটতম পরিচিত বন্ধু হিসাবে একমাত্র আমার নামই হাসপাতালের আবেদন পত্রে উল্লেখিত থাকায় ওর ব্যক্তিগত সম্পত্তি হিসেবে সুটকেশটা আমার কাছেই এসে পৌঁছল ক'দিন পরে।

কতকগুলো আজে বাজে জিনিসের মধ্যে আছে সেই সোনার ঘড়িটা, একটা ক্যামেরা আর দুটো পেন।

আর একটা ছোট ডায়েরী।

হরনাথের বিভিন্ন সময়ের মনের প্রতিবিম্ব সেই ডায়েরীর পাতায় পাতায় বিধৃত। লেখাগুলোর কোন ধারাবাহিকতা নেই, কোন তারিখ নেই, কার উদ্দেশে লেখা সে কথাও বোঝার উপায় নেই, তবু আমি যা হাতড়ে বেড়াচ্ছিলাম এতদিন, তার অনেক কিছুরই খোঁজ পেয়ে গেলাম বিচ্ছিন্ন, অসংলগ্ন ঐ লেখা থেকে।

অজস্র দুর্বোধ্য গ্রন্থি মুক্ত করে আমি এইটুকু উদ্ধার করেছি:

...ওরা আমার ডানদিকের ফুসফুসটা অপারেশন করে বাদ দিতে চায়। আমার মনে হয় না ওরা আমাকে বাঁচাতে পারবে। কিন্তু তবুও ওরা ওদের পথে চলে' ওদের ভুল বুঝুক। আমি জানি এই অপারেশনেই আমার মৃত্যু হবে...কিন্তু আর আমি ভয় করি না। আমার জীবনের বত্রিশ বছর প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। এবার আমায় মরতেই...

…আজ আমি সবরকমেই প্রস্তুত। বিলাস আর প্রাচুর্যে অতীতটাকে ভালই কাটিয়েছি—এ বিশ্বের অনেক দেখেছি অনেক জেনেছি—কোন কিছুতেই অতৃপ্তি আর নেই।

…সু' আজ বিবাহিত—ও নিশ্চয়ই সুখী হয়েছে। আর, আর আমিও তো সুখীই হয়েছি। জন্মান্তরবাদ যদি সত্যিই হয়, যদি আমি আবার জন্মগ্রহণ করি, অন্ততঃ এ রোগ যেন আমার আর না হয়…

…আচ্ছা 'সু', স্বামীর নিবিড় আলিঙ্গনে আবদ্ধ থেকে আজও কী আমার কথা তোমার মনে পড়ে? হয়তো পড়ে না। কিন্তু যদি আজও তোমার মনের নিভৃত প্রদেশে আমার স্মৃতি থাকে, তবে লক্ষ্মীটি সু, আমার কথা রাখতে অন্ততঃ তুমি তোমার স্বামীকে ভালবেসো—সুখী হ'য়ো। থাক সে পুরোনো স্মৃতি বিস্মৃতির অন্তরালে। মৃতের জন্যে ভেবে আর কষ্ট পেও না। হ্যাঁ আমি মৃতই আজ, শারীরিক অর্থে নই অবশ্য, কিন্তু তাও খুব দূরে নয়। আমাকে ভুল বুঝো না সু। তুমিই বল ঐ রকম একটা ভাগ্যলিপি যার মাথার ওপর খাঁড়ার মত ঝুলছে সে কী করে বিয়ে করবে তোমাকে?

এগুলো অপারেশনের আগে লেখা, বুঝতে অসুবিধে হয় না। এর পরেও লিখেছে:

…আমি সেরে গেছি! আমি সুস্থ আজ! আবার আমি সুন্দর স্বাভাবিক জীবনে ফিরে যেতে চলেছি, একথা কী কেউ বিশ্বাস করতে পারবে? ওরা বলেছে আমি আবার পাঁচজনের মত ঘুরতে ফিরতে, কাজ করতে পারবো। এ যেন স্বপ্ন! বিজ্ঞানই জিতলো শেষ পর্যন্ত—আমি সুখী, প্রচণ্ড সুখী আমি আজ। কিন্তু—এই অভিশপ্ত জীবনের ভার বহন করে কি হবে? আমার বাঁচার অধিকার আমি নিজেই হারিয়েছি।—

…আমার সু আজ আর আমার নয়। কোন দিন ও আমার হবে না। জীবনে আমার একমাত্র স্বপ্ন ছিল ওকে নিয়ে—। না, আমার এই অনিশ্চয়তার মধ্যে ওর জীবনটাকে নষ্ট হ'তে দিতে

আমি চাইনি। ওকে মিথ্যে আঘাত আর উপেক্ষা দিয়ে দূরে সরিয়ে দিয়েছি।—

…To be or not to be? সত্যিই, এটাই আজ একমাত্র প্রশ্ন। কিন্তু কী করে'? কী করে' এই শূন্যতা নিয়ে আমি বেঁচে থাকবো…? স্থির নিশ্চিত মৃত্যুকে বরণ করে নেওয়ার জন্যে আমি আমার শেষ কপর্দক পর্যন্ত খরচ করে' হঠাৎ জানতে পারলাম যে হিসেব আমার ভুল হয়ে গেছে—মরতে আমায় হবে না, আমাকে বাঁচতে হ'বে!

…না, আর বাঁচার প্রয়োজন নেই। তাছাড়া কী করেই বা বেঁচে থাকবো…?

…তবে কী মৃত্যু? কিন্তু কেমন করে?

…আমাকে ক্ষমা কোরো সু। তোমার ভালবাসা—তোমার বিশ্বাসের অপমান করলাম হয় তো।…

হরনাথের কাহিনীর এখানেই শেষ। কিন্তু আমার কাহিনী শেষ হ'ল না।

আমি আজও ভাবছি ওর মৃত্যুর জন্যে দায়ী কে? ওর ভাগ্য? না ওর নিজের তৈরী হতাশা?

দিনের পর দিন

মোড়ের মাথায় জরাজীর্ণ বাড়ীটায় যৌবনের আভাস দেখা যাচ্ছিল মাস দুই ধরে, গত সপ্তাহ থেকে বুঝি জোয়ার এসেছে। উপ্‌ছে পড়ছে এতদিনের স্তব্ধ রহস্যঘেরা প্রাসাদটার সবে রঙ করা দেয়ালের বাঁধন ডিঙিয়ে, মাধুরীর বান্ধবী সুমতিদের গলি পর্যন্ত। আর সুমতি মারফৎ মাধুরীদের ছোট্ট নিরিবিলি ফ্‌ল্যাটটার দোতলায় এই বারান্দা অবধি।

সুমতিদের বাড়া থেকে ফিরে এসেও মাধুরী বারান্দায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সেই হঠাৎ-খুসী বাড়ীটার ঘ্রাণ নেবার চেষ্টা করে।

এমনি হয় মাধুরীর। তার পরিচ্ছন্ন ছোট্ট সংসারের অন্তরঙ্গতার মধ্যেও কেমন যেন একটা চাপা দীর্ঘশ্বাস লুকিয়ে থাকে, কোলাহলমুখর বিয়েবাড়ীর উৎসবের ছোঁয়া লাগলেই মাথা তোলে। সে কি তার বিয়েতে উৎসবের অভাব ঘটেছিল সেইজন্য? না, তার জন্য দুঃখ নেই মাধুরীর। নিজেই প্রায় জোর করে বিয়ে করেছিল সুখময়কে, মা-বাবা আত্মীয়স্বজনের অমত সত্বেও। সুখময়ের ভালবাসায় কোন ফাটল ধরেছে সে কথাও ভাবতে পারে না মাধুরী। তবু যেন নিজের মনের মধ্যে কোথায় একটা কাঁটা থেকে থেকে ব্যথা জাগায়, যেমনটি ঠিক ভেবেছিল তেমনটি যেন হয়নি। না, হয়নি বললে ভুল হবে। হচ্ছে না। প্রথম দিকের সে তৃপ্তিতে যেন ভাটা এসেছে। সে কি

তৃপ্তির অবসাদ, না দৈনন্দিন ঘনিষ্ঠ জীবনের অভিশাপ? সুখময়কে যেন আগের মত ভালবাসতে পারছে না মাধুরী, অথচ চাইছে।

বিবাহোৎসবের ছোঁয়া লাগলেই তাই আজকাল মনে মনে ভাবে মাধুরী, ওদের এই উচ্ছলতা ক'দিন টিকবে? কতদিন ওরা পরস্পরকে ভালবাসতে পারবে—ঠিক মাধুরী আর সুখময় যেমন বাসতো বিয়ের আগে থেকে দু'তিন বছর পরে পর্যন্ত? বিশ্লেষণ করে দেখতে চেষ্টা করে, যে দুটি জীবন চিরকালের জন্য মিলিত হলো তাদের মধ্যে মিল কতটুকু, ভালবাসার প্রেরণা কতখানি।

বিশেষ করে সুমতির কাছ থেকে বিশ্বাস-বাড়ীর নতুন বৌ সম্বন্ধে যে তথ্য সে সংগ্রহ করেছে, সেইগুলিই মনের মধ্যে আলোড়ন জাগায়। যেমন আকাট মুর্খকুশ্রী ব্রজহরি, তেমনি শিক্ষিতা সুন্দরী হয়েছে ওর বৌ। মাধুরী আশ্চর্য হয়, শিপ্রার মত মেয়ে ব্রজহরিকে বিয়ে করতে গেল কোন্ কারণে? ব্রজহরি কৃতার্থ হয়েছে, কিন্তু শিপ্রা কী দেখেছে ব্রজহরির মধ্যে? কোনদিন এক মুহূর্তের জন্য সে ভালবাসতে পারবে ব্রজহরিকে?

সুমতি বলে, টাকার জন্য! মাধুরী বিশ্বাস করে না। যত গরীবই হোক শিপ্রার মত সুন্দরী শিক্ষিতা মেয়ে কোন অবস্থাপন্ন ছেলেকে চাইলেই পেতে পারতো। তাছাড়া সুমতিই বলেছে, এমনি বেশ ভালো মেয়েটি: নিজে সে দেখে এসেছে।

এরি মধ্যে কখন যে বেলা গড়িয়ে পাঁচটার কাঁটা পার হয়ে গিয়েছে খেয়াল হয় নি। যখন খেয়াল হলো তখন সুখময়ের অফিস-ক্লান্ত চেহারাটা মোড়ের মাথায় দেখা দিয়েছে।

দ্রুত হাতে স্টোভ্ জ্বালালো মাধুরী, এখন আর উনুন ধরানোর সময়

নেই। তার চেয়ে ক্ষিপ্র হাতে বেণীটা জড়িয়ে নিল, চুল বাঁধার অবসর নেই।

বাইরে চা ছাড়া আর কিছুই খায় না সুখময়। কখনো বলে, বাইরের খাবার ভাল লাগে না। কখনো বলে, ক্ষিধে পায় না। অথচ বাড়ী এসে খাবার পেতে এক মিনিট দেরী হলেই—। জানে মাধুরী, প্রথম কৈফিয়ৎটা আংশিক সত্য, দ্বিতীয়টা নির্জলা মিথ্যা। আসলে ওর খাওয়া হয় না পয়সার অভাবে, রোজ রোজ বাইরে খাওয়ার খরচ তো কম নয়। কী করে কুলোবে সুখময় এই সামান্য মাইনের চাকরীতে?

সুখময় মুখ হাত ধুতে ধুতেই খাবার তৈরী হয়ে যায় মাধুরীর।

প্লেটটা নিয়ে চলে যাচ্ছিল মাধুরী, সুখময়ের তখন খেয়াল হয়। কৈ তোমার নেই?

মাধুরী বলে, আছে, আছে, তোমায় ভাবতে হবে না। ঈস্ এতক্ষণে কথা ফুটলো বাবুর মুখে। দাঁড়াও, চা নিয়ে আসি, খবর আছে। এক মিনিট।

এক মিনিট নয়, মিনিট পাঁচেক পরে যখন মাধুরী চা নিয়ে এলো তখন এক দফা প্রসাধন হয়ে গেছে।

চায়ে চুমুক দিয়ে সুখময় বললে, আজ তোমায় যেন—

ঝঙ্কার দেয় মাধুরী। আহ্‌া, রোজই আজ তোমার যেন—

তারপর গোপন কথা বলার ভঙ্গীতে বলে, কিন্তু পাড়ায় যে সত্যিই বিদুষী উর্বশী এসেছে, সে খবর রাখো?

সিগারেট ধরাচ্ছিল সুখময়, ভ্রূ কুঁচকে বললো, তাই নাকি নতুন ভাড়াটে বুঝি? কোন বাড়ীটায়? বৌ না মেয়ে?

চায়ের কাপ দুটো সরিয়ে চেয়ারটা টেনে এনে মাধুরী বললো, বৌ বৌ, নতুন বৌ। বিশ্বাসদের বাড়ী বিয়ে হলো না সেদিন—

কৃত্রিম হতাশায় গা এলিয়ে দিলো সুখময়।—ওহ্‌, নতুন বৌ। পুরানো হলেও না হয় দেখা যেত চেষ্টা করে।

—আহ্‌া, কথা কিছু আটকায় না মুখে, যে চেহারা হচ্ছে দিন দিন—

—তা, তোমার ব্রজহরি বিশ্বাসই বা কি কন্দর্পকান্তি ?

সুখময়ের ইজিচেয়ারের হাতালে এসে এবার বসলো মাধুরী। —সেই কথাই তো বলছি। অমন সুন্দর লেখাপড়া জানা মেয়ে, শুনছি এম, এ, পাশ ; ব্রজহরি বিশ্বাসকে বিয়ে করতে গেল কোন দুঃখে? কী কপাল, বলোতো।

সুখময় বললে, কেন 'খারাপটা কি কপাল? তিনখানা বাড়ী এপাড়াতেই, আরো কটা আছে কে জানে। অতো বড়ো হার্ডওয়ারের দোকান। এর চেয়ে সুখতো আই, এ, এস, বিয়ে করেও পেতো না।

মাধুরী বললে, ঈস্ টাকাতেই বুঝি সব? তোমরা তো ওই জানো। আমি হলে কখনো রাজী হতাম না। ওই বিদঘুটে চোহারা, আই, এ ফেল—

দার্শনিক ভঙ্গীতে বললো সুখময়—হ্যাঁ, জানা আছে আমার মেয়ে-চরিত্র। শাড়ী বাড়ী গয়না, পাই না তাই চাই না।

চোখ পাকিয়ে মাধুরী বললো, বাজে কথা বোলো না। আমার কতো ভালো ভালো সম্বন্ধ এসেছিল, জানো?

সত্যিই জানে সুখময়, ভালভাবেই জানে। সারা বাড়ীর বিরুদ্ধে লড়েছিল মাধুরী, সুখময়ের জন্য।

আদর করে কাছে টেনে নিয়ে বললো, পাগল কেথাকার। কথার কথা বললাম একটা, অমনি ফোঁস।

মাধুরী-সুখময়ের অতীত স্মৃতির বন্যায় বিশ্বাসদের নতুন বৌ-এর আলোচনা ধুয়ে গেলো সেদিনের মতো।

এরপর মাধুরী আর সুখময় একদিন স্বচক্ষেই দেখলো নতুন বৌ শিপ্রাকে।

রবিবারের বিকেল। সিনেমা থেকে ফেরার পথে মোড়ের মাথায় একেবারে মুখোমুখি। ব্রজহরির নতুন কেনা মোটরটা এক মুহূর্ত আটকে গিয়েছিল ভীড়ের জন্য। গলির মধ্যে ঢুকে মাধুরী বললো, দেখলে? গাড়ীটা নতুন কিনেছে বৌয়ের জন্য।

দেখেছে বৈকি সুখময়। অমন মেয়ে এমনিতেই নজর যায়, তাতে ব্রজহরি বিশ্বাসের মতো কাঠ কয়লার পাশে। কাঠ কয়লার কথাই মনে হলো সুখময়ের, কারণ শিপ্রার অগ্নিশিখার পাশে ব্রজহরিকে দেখাচ্ছিল ভিজে ভিজে নিস্তেজ।

মিথ্যা বলেনি মাধুরী, ব্রজহরির পক্ষে শিপ্রার মতো শিক্ষিতা সুন্দরী মেয়ে বেমানান, একেবারে অসহ্য বেমানান।

কিন্তু কেন গেল শিপ্রা ব্রজহরিকে বিয়ে করতে? গরীব বলে? ওর মতো মেয়ে যে কাউকে বিয়ে করে মাস্টারী করেও সংসার চালাতে পারতো।

বাড়ী ফিরে বললো, দেখলাম তোমার নতুন বৌকে। সুন্দরী নিশ্চয়ই, হাজারবার মানতে হবে, তবে করুণার পাত্রী নয়।

মাধুরী বললো, তবে? খুব জাঁহাবাজ মনে হলো বুঝি তোমার?

—তা জানি না পরস্ত্রী সম্বন্ধে ও কথাটা না বলাই ভালো। তবে ওকে দেখে বুঝতে পারলাম কেন ব্রজহরিকে বিয়ে করেছে।

—কেন, তুমি চেনো নাকি? কাপড় বদলানো বন্ধ রেখে মাধুরী এসে দাঁড়ালো মুখোমুখি।

—চিনি না। তবে মুখ দেখলে বুঝতে পারি।

এই! সন্দেহ শুধু! চটে উঠলো মাধুরী।—কি বুঝেছ?

নির্বিকার চিত্তে জামাটা টাঙ্গিয়ে রেখে ধীরে ধীরে ব্যঙ্গের সুরে সুখময় জবাব দিলো, কেন বুঝতে পারছো না?

—না। মনটা ভারী ছোট হয়ে গিয়েছে তোমার আজকাল। বলতে চাইছো তো মেয়েরা টাকার জন্যে, সুখের জন্যে বিয়ে করে, ও তাই করেছে—

হেসে সুখময় বললো, এই না হলে মেয়ে বুদ্ধি। তোমার বিদুষী উর্বশী বৌটি ব্রজহরির মতো আকাটকে বিয়ে করেছে উড়ে বেড়াতে পারবে বলে, বুঝতে পারছো না? দেখছো না নতুন গাড়ী এসেছে, আগাছা পরিষ্কার করে বাগান হচ্ছে ব্রজহরির বাড়ীতে,

ফরাসের বদলে সোফাসেট, দামী আয়না বসছে, রাস্তা থেকেই তো দেখা যায়—

ক্রুদ্ধ হয়ে মাধুরী বললো, তুমি আসলে ঈর্ষা করছ ব্রজহরিবাবুকে।

সুখময় হেসে বললো, আর তুমি করছ ব্রজহরির বৌকে।

সে রাত্রে মাধুরী রাগ করে কথা বললো না।

ঠিক এই কারণেই, সুখময় মনের উদারতাটুকু হারিয়ে ফেলেছে বলেই, মাধুরীর দীর্ঘশ্বাস।

এতদিন খবর দিয়ে এসেছে মাধুরী এবার সুখময়ের পালা।

মাস তিনেক পরে সুখময় একদিন রাত্রে ফিরে বললো, শুনেছো, তোমার উর্বশী যে আজকাল নিজেই মোটর চালাচ্ছে।

সেদিন মাধুরীর মেজাজ ভাল ছিল না। চড়া গলায় জবাব দিলো, নিজের থাকলেই চালায়। দাও না কিনে আমিও শিখে নেবো তুমাসে।

সুখময়ের মনটা কিন্তু খুসী ছিল বোনাস পাওয়ার আনন্দে। হেসে বললো, মোটর না পারি মটর মালা একটা দিতে পারি।

মেজাজটা খারাপ ছিল হাতে টাকা না থাকার জন্যেই। টাকা পেয়ে মাধুরীর মনের কালো মেঘটুকু কেটে গেলো। টাকাটা হাতে নিয়ে বললো, পেলে তাহলে সত্যি? আগে কিছু জানাও নি তো।

সুখময় অফিসের পোষাকেই গা এলিয়ে দিলো চেয়ারে।—অবাক করে দেবো বলেই তো জানাই নি।

টাকাটা তুলে মাধুরী রেখে শুধালো, কী বলছিলে? নতুন বৌ মোটর চালাচ্ছিল, ব্রজহরি বিশ্বাসকে পাশে রেখে?

সুখময় বললো, বিশ্বাস পাশে থাকলে আর মোটর চালিয়ে আনন্দ কি? একাই চালাচ্ছিলেন বিশ্বাস-মহিলা।

আকাশ থেকে পড়লো মাধুরী। একা!

—তাই তো বলছি।

অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে মাধুরী আস্তে আস্তে তিক্ত গলায় বললো, তাই, তাই বেছে বেছে বিশ্বাসের মত গোবেচারীকে বিয়ে করেছে। বিশ্বাসবাড়ীর নতুন বৌ সম্বন্ধে মাধুরীর কৌতূহলের এইখানেই সমাপ্তি হতো যদি না আরো চমকপ্রদ সংবাদটা সুমতি মারফৎ এসে ওর কানে পৌঁছতো।

মাধুরী বললো, না, না একি বলছিস তুই! একী হয়? সম্ভব কথা একটা?

সুমতি বললো, বিশ্বাস না হয় চল্‌না একদিন বিকেল বেলা আমাদের বাড়ী। ছাদ থেকে দেখাবো তোকে—নতুন বৌ এর মুখে হাসি ফুটেছে আজকাল—বাগানে ঘুরে বেড়ায়, হাওয়া খেতে যায় বিশ্বাসকে পাশে নিয়ে—

—বলিস কি? আজকাল বিশ্বাসকে সঙ্গে নিয়ে যায়?

—যাবে না কেন? তুই বুঝি জানিস না, তখন একা একা তো সেখানেই যেত। বিশ্বাস যখন মেনে নিয়েছে, কাছাকাছি পেয়েছে—তা যাস একদিন, দেখবি, দেখেই বুঝতে পারবি। তাছাড়া জানতে তো আর বাকী নেই কারো, কতদিন আর লুকোবে ঝি-চাকরের কাছে।

সুমতি চলে গেলে স্তম্ভিত হয়ে বসে রইলো মাধুরী। নতুন বৌ নয়, ব্রজহরির কথাটাই ভাবছিল সে। পারলো সেকালের গোঁড়া বনেদী বংশের ছেলে ব্রজহরি বিশ্বাস এত বড় অনাচারটা মেনে নিতে? এত অন্ধ ভালবাসা মূর্খ ব্রজহরির? বোকা বোকা, নিরেট গবেট ব্রজহরি।

খবরটা শুনে সুখময়ের কিন্তু অদ্ভুত পরিবর্তন দেখা গেল। চায়ের কাপটা মুখ থেকে নামিয়ে অবাক হয়ে বললো, ঠিক বলছ তুমি? ব্রজহরি জেনে শুনে—? আশ্চর্য তো।

মাধুরী বললে, কী বোকা দেখ। ও ভেবেছে উদারতা দেখিয়ে মন

জয় করবে ওই মেয়ের। ঠিকই বলেছিলে তুমি ও মেয়ে সহজ নয়
—উড়ে বেড়ানোর জন্যই গোবেচারা লোকটাকে—ওকি চা ঠাণ্ডা হয়ে
গেল যে, কী ভাবছ?

চায়ের কাপটা তুলে নিয়ে সুখময় বললো, না মাধু, ব্রজহরিকে যত
বোকা আমরা ভেবেছি তত বোকা নয়—

—বোকা নয়?

—না। বোকা হলে, ওর অপরাধটার বেত হাতে নিয়ে শিপ্রাকে
শাসনে রাখতে পারতো। তা করেনি ও। এই উদারতা দিয়ে
নিজেকে কতখানি উঁচুতে তুলে ধরেছে দেখ। শিপ্রা এবার
কোনদিন আর অবজ্ঞা করতে পারবে না ব্রজহরিকে—

—তার মানে, তুমি বলছ, শিপ্রা এবার থেকে সত্যিই ভালবাসবে ওকে?

চায়ের কাপটা শেষ করে সুখময় বললো, হ্যাঁ। ব্রজহরির মধ্যে শ্রদ্ধা
করার মত কিছু পাচ্ছিল না বলেই—

—ভ্রূভঙ্গী করে মাধুরী বললো, ব্রজহরিবাবু চরম উদারতা
দেখিয়েছেন, সেকথা আমি অস্বীকার করছি না। কিন্তু শিপ্রা কি
সেই মেয়ে? হয়তো কৃতজ্ঞতা একটু থাকবে, কিন্তু কৃতজ্ঞতাটা, বা
ধরো শ্রদ্ধাটাই তো ভালবাসা নয়।

—তা নয়, কিন্তু সেটাই মূল ভিত্তি। মনে আছে মাধু? আমাদের
বিয়ে ঠিক হয়ে যাওয়ার পরেই আমার ভাল চাকরীটা পুলিশ রিপোর্টে
চলে যায়, তারপর তোমার অনেক ভাল সম্বন্ধ এসেছিল, তুমি
বলেছিলে আমাকেই বিয়ে করবে—

উজ্জ্বল হয়ে ওঠে মাধুরীর মুখ। বলে, আর তুমি তারপর কী
করেছিলে মনে নেই?

কাছে টেনে নিয়ে গভীর সুরে সুখময় বলে, হ্যাঁ মাধুরী, মনে আছে
বৈকি, তাইতো বলছিলাম—কিন্তু আমরা কেন কেমন যান্ত্রিক, সংকীর্ণ
হয়ে যাচ্ছি। শুধু দোষ ত্রুটিটাই নজরে পড়ে—শিপ্রা ব্রজহরিকে
কী অবজ্ঞা করতো, অথচ কত মহৎ দেখতো।

সুখময়ের বুক থেকে মুখ তুলে মাধুরী বলে, কিন্তু শিপ্রার মধ্যে—?

হেসে বললো সুখময়, আছে বৈকি মাধু। ওর মধ্যেও মহত্ত্ব আছে বৈকি। উড়ে যদি বেড়াতে চাইতো সে তবে কি নিজের কলঙ্কের নিদর্শন ওই ছেলেটিকে সে ভুলে যেতে পারতো না? নিষ্ঠুর যারা তারা মুছে দেয় সে কলঙ্ক, যাদের একটু মায়া আছে তারা অনাথ আশ্রমে দিয়ে কর্তব্য শেষ করে। শিপ্রা তা পারেনি, এতখানি সুখ ঐশ্বর্যের মধ্যে বসেও, সব কিছু হারাবার বিপদ মাথায় নিয়েও সে ব্রজহরিকে বলেছে—

স্বপ্নাবিষ্ট সুরে মাধুরী বলে, তাই তো, এদিকটা তো আমি ভাবিনি; গালাগালিই দিয়েছি শুধু ওকে—সত্যি কত ছোট হয়ে গেছি আমি—

সুখময় বলে, তুমি শুধু নয়, আমিও। আমি জানি মাধু। তোমার আমার মাঝখানে—

দু'হাত দিয়ে সুখময়ের মুখটা বন্ধ করে দেয় মাধুরী, ছি ছি, না না।

—না, নয় মাধু। আমি অনুভব করেছি আমি ছোট হয়ে যাচ্ছি, তুমিও, হ্যাঁ তুমিও ছোট হয়ে যাচ্ছিলে। পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধা হারিয়ে ফেলছিলাম। আমরা পরচর্চায় আনন্দ পেতাম, নিজেরা ছোট হয়ে যাচ্ছি জেনেও—

নিবিড়ভাবে সুখময়ের মধ্যে মিশে গিয়ে মাধুরী বলে, না, না, ছোট তুমি নও। এখন তো আর ছোট নও। ছোট হলে একথা কখনই বুঝতে না তুমি।

বিবেক

জামা কাপড়ের ব্যবসা বিনোদের। ব্যবসা মানে তেমন দোকান সাজিয়ে জমকালো কিছু নয়, রাস্তার ধারে একটা বারান্দার কোণে শ দুয়েক টাকার সওদা নিয়ে তার ব্যবসা।

চাকরি একটা সে জুটিয়েছিল অনেককাল আগে, তখন এমন ছিল না। সে সব দিন আর আসবে না। হন্যে হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে লোক পেটভাতার জন্যে। তা সে চাকরিটাও গেল হিড়িকে পড়ে। হিড়িকটা যে কি তা ঠিক ঠাওরও পেল না সে। একদিন একটা নোটিস ঝুলিয়ে বন্ধ হয়ে গেল কারখানার ফটকটা। দিন দশেক বাদে যখন খুললো, জনা ম্লাটেক লোকের জবাব হয়ে গেছে।

বৌটার যা দু একখানা গহনা ছিল তাই বিক্রী করে অনেক ভেবে চিন্তে জামা কাপড় ফিরি করেছিল প্রথমে। তারপর ছেড়ে দিয়ে এই দোকান। ক'মাস চেষ্টা ক'রে দেখেছে ফিরি করার ঝামেলা অনেক। খাটুনি বেশী, লাভ কম। মা-ঠাকরুণরা সওদা করতে ওস্তাদ, চট ক'রে দাম বলে বসে অর্ধেক। বাজার থেকে বেশ কিছু সস্তা না পেলে কেনে না। বলে,—এতো দামেই যদি নেব তো দোকান থেকেই নেব। তারও পরে আর একটা বড় কথা হচ্ছে ধার। মা-ঠাকরুণদের কাছে পয়সা থাকে না, অথবা থাকলেও দেয় না। ফিরিওয়ালার কাছে পয়সা ফেলে রাখা যায়। নগদ দামে কিনতে হ'লে পাঁচ দশটা দোকান ঘুরে বাজার থেকে কেনাই ভাল। হাতে পয়সা না থাকলে অথবা সস্তা পেলে তবেই না লোকে ফিরিওয়ালার কাছে কেনে।

অনেক কষ্টে জায়গা জুটিয়েছে তারপর। কিন্তু বসতে পেলেই হয় না,

বিক্রী বড় কম। আয় যত দরকষাকষি এইখানে। রেশন কেনো বাঁধা দর, ঘি নুন তেল চিনি যা দাম চাইবে তাই দেবে, ওষুধ কিনতে যাও তো বাঁধা দরের ওপরেও কিছু দাও। কিন্তু এখানে এসেই যত ছেকড়াছেকড়ি।

তবু টিকে আছে বিনোদ, এছাড়া অন্য উপায় নেই বলে। এক ভরসা পুজোর সময়টা আর শীতের মুখোমুখি। যা দুটাকা আসে তাই ভাঙিয়েই সারা বছরের ধারটা সামাল দিতে হয়।

এইতো ভাদ্র মাসের দশ তারিখ। এবার বড্ড দেরী পুজোর, সেই আশ্বিনের আঠাশে। এদুটো মাস আর কাটতে চায় না। বড় জোর চারটে গেঞ্জি, দুখানা গামছা, একটা ওয়াড়, ব্যস্ এই হলো বিক্রী। ক' পয়সাই বা থাকে তাতে? চার আনা, আট আনা, না হয় বড় জোর বারো আনা।

কিন্তু আজ বোধ হয় হতভাগা বৃষ্টির জন্য তাও হলো না। ছাট বাঁচাতে অয়েল ক্লথটা চাপা দিয়েও কোলের কাছে একটু খুলে রাখতে হয়েছে যাতে লোকে বুঝতে পারে জামা কাপড় পাওয়া যায় এখানে। শাড়ী ক'খানা আর দু একটা ফ্রক ব্লাউজ কোলাপ্সিবল গেটটার গায়ে দড়ি দিয়ে ঝোলানো আছে, ওগুলো ভিজবে না।

একটা পয়সা বিক্রী হয়নি আজ সারাদিনে। বিষ্টি বাদলার দিনে আবার খদ্দের ডাকতেও লজ্জা করে, কেমন কটমট করে তাকায় কেউ কেউ। ও যেন ভিক্ষে চেয়েছে। শুধু পথচারী লোকের মুখের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে বিনোদ বোঝার চেষ্টা করে ওদের মধ্যে কারো কাপড় জামার দরকার আছে কিনা।

অফিসের ভিড় শেষ হয়ে গেল। আজ কি আর কেউ বেরুবে বাড়ী ছেড়ে?

সাতটা নাগাদ ধড়ে প্রাণ পেল বিনোদ। ছেঁড়া ছাতা হাতে এক প্রৌঢ় ভদ্রলোক ভিজতে ভিজতে এসে দাঁড়ালেন বিনোদের সামনে। কোলের কাছটা আর একটু খুলে ফেললো বিনোদ,এ লোকটা নিশ্চয়ই জরুরী কোন দরকারে কাপড় কিনতেই বেরিয়েছেন।

ভদ্রলোক ছাতাটা বন্ধ করে, কোঁচার খুঁট দিয়ে মাথা আর জামাটা মুছে ফেললেন। কাদা জল ছিটকে বিনোদের পসারেও একটু আধটু পড়লো। কিন্তু সে কোন আপত্তি করতে পারলো না। খদ্দের লক্ষ্মী, চটানো ঠিক নয়।

ভদ্রলোক এবার পকেট থেকে বিড়ি বার করলেন।

—নাঃ, দিশলাইটা ভিজে গিয়েছে, ধুত্তোর—ওহে, দিশলাই আছে তোমার কাছে, দিশলাই? দাও তো একটু—

বিনোদ কৃতার্থ হয়ে দেশলাইটা এগিয়ে দিল, আজ্ঞে হ্যাঁ, এই যে আসুন।

বিড়িটা ধরিয়ে ভদ্রলোক একটা টান দিয়ে বললেন, কি বৃষ্টি দেখেছো, যত শালা বৃষ্টি কলকাতা শহরে। যা না পাড়াগাঁয়ে যা না, কাজ হবে।

সায় দিয়ে বিনোদ বলল, দেখুন না, সারাদিন এক পয়সা বিক্রী নেই।

ভদ্রলোক একবার চোখ বুলিয়ে বললেন, কী কী আছে হে তোমার কাছে?

এই মুহূর্তটির অপেক্ষা করছিল বিনোদ, চট করে খুলে ফেললো অয়েলক্লথটা—এই যে দেখুন না, শান্তিপুরী, ফনেখালি, টাঙ্গাইল, ঢাকাই বুটিদার, সিম্পি তাঁতের। কী চাই আপনার বলুন, ব্লাউজ, সায়া, ফ্রক, প্যান্ট, সার্ট?

একটা একটা করে তুলে দেখায় বিনোদ।

ভদ্রলোক ঘাড় নাড়েন, ধুতি নেই,ধুতি?

—আজ্ঞে, হ্যাঁ, আছে বৈকি। দুখানা তাঁতের ধুতি বার করে ফেললো বিনোদ।

—এ কি হবে ? আটপৌরে মিলের ধুতি চাই। আমাদের কী আর তাঁত পরার বয়েস আছে, না পয়সা আছে ? তারপর হঠাৎ চটে গেলেন ভদ্রলোক, তুমি ত বেশ রসিক দেখছি, চাইলাম মিলের—

বিনোদ অপরাধ করে ফেলেছে। বলে, আজ্ঞে মিলের ধুতি শাড়ী তো কনটোল ছাড়া পাবেন না।

—সেটা আর নতুন কথা কি শোনালে বাপু ? দিতে পারতে দু একখানা মিলের, না হয় একটু বেশীই নিতে. তাই শুধোচ্ছিলাম। এমনি তো চোরাই মাল টাল, কি একটু আধটু ছেঁড়াটেঁড়া বিক্রী করো সব তোমরা।

বৃষ্টিটা একটু ধরে এসেছে, বিনোদের জবাবের অপেক্ষা না করেই ভদ্রলোক ছাতা খুলে এগিয়ে গেলেন।

বিনোদ আবার অয়েলক্লথটা চাপা দিল। কিনবে না ও। এমনি অনেক লোক আছে, যারা শুধু দেখে, দর করে, বাড়ী গিয়ে বা বন্ধু মহলে গল্প করার জন্যে। আর একদল আছে যাদের পকেট ভারী, কিন্তু হুঁসিয়ার, হঠাৎ সস্তা পেলে কিনে ফেলে। এ লোক তা নয়, দরটাই শুধোলো না।

হতাশ হয়ে পড়ে বিনোদ। খদ্দের এলে না হয় কেনা দামেই একটা কিছু ছেড়ে দিতো। রেশন তো কাল আনতেই হবে। রাতেই বা শুকনো রুটী খাবে কি দিয়ে ? অন্তত পেঁয়াজ তো দুটো চাই। হাত যে একেবারে খালি। মেয়েটা এতক্ষণ কাঁদছে আর পুষ্প ঠেঙাচ্ছে নিশ্চয়ই। কবে যে এ কটা দিন যাবে ? প্রতি বছরই কঠিন সময় এই পুজোর আগেটা।

হঠাৎ চমক ভেঙে গেল।

—ভালো শাড়ী আছে হে ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ আছে বৈকি, এই যে দেখুন। বলার সঙ্গে সঙ্গে এক ঝটকায় খুলে ফেলে বিনোদ অয়েলক্লথটা। খদ্দের এ লোকটি। হে ভগবান !

সবগুলো উলটে পালটে দেখে একখানা শেষ পর্যন্ত পছন্দ করলেন ভদ্রলোক।

—কী নেবে হে?

—কুড়ি টাকা, আজ্ঞে।

—কুড়ি? বলো কি? নাঃ, তোমার কাছে হলো না আর।

ভদ্রলোক পা বাড়াতে মরিয়া হয়ে উঠলো বিনোদ।

—কত দেবেন বাবু? নিন ওখানা, না হয় দুটাকা কমই দেবেন। সারাদিন বউনি হয়নি, বাবু।

ঘুরে দাঁড়িয়ে ভদ্রলোক বললেন, বউনি হয়নি কি হে? পাট তোলার সময় হলো যে।

বিনোদের মনে হলো লোকটি নিশ্চয়ই নিজেও ব্যবসা করে, না হলে বউনির কথায় কান দিতো না, দামটা নিয়েই কথা বলতো।

—আজ্ঞে হ্যাঁ বাবু, কী আর বলবো বলুন। সারাদিন বৃষ্টিতে সর্বনাশ করে দিলে।

—তা হঠাৎ দুটো টাকা কমিয়ে ফেললে যে। লাভ কি রকম করছো বলো দিকি। এতো বাপু টাকা বারোর বেশী হবে না মনে হচ্ছে।

—আপনার পা ছুঁয়ে বলছি বাবু, চৌত্রিশ টাকা জোড়া কেনা।

বিনোদ মরিয়া হবে পাটা সত্যি ছুঁতে যাচ্ছিল। সরিয়ে নিয়ে ভদ্রলোক বললেন, ঠিক কতো হলে দেবে বলো তো?

—দিন, আট গণ্ডা পয়সা অন্তত দিন। সারাদিন বেচা বিক্রী নেই।

ভদ্রলোক শাড়ীটা হাত থেকে নামিয়ে রাখলেন আবার।—না বাপু পনের টাকার বেশী হবে না।

বিনোদ হাত জোর করে উঠে দাঁড়ালো।—অন্তত কেনা দামটাই দিন দিন বাবু।

—ওহে বাপু, ব্যবসা আমিও করি। টাকায় দু এক আনার বেশী লাভ করতে নেই, অধম্ম হয়। তুমি যে দাঁও মারতে চাও দেখি।

—আজ্ঞে তাহলে বাবু অনেক টাকা বিক্রী আপনার। অনেক একশো

টাকা আসে। আমার যে মোটে এই বাবু, সারাদিনে দু'খানা কি একখানা জোর। চারটে পেট তো চালাতে হবে, বাবু। জিনিস পত্তরের দাম তো দেখছেন—

বিনোদ অনুনয় করে কেনা দামটাই পাবার জন্যে। যেন বিশেষ অনুগ্রহ চাইছে, কৃপাপ্রার্থী সে।

ভদ্রলোকের মনটা বোধ হয় গললো একটু। বড়লোক বড়মানুষ বলে অনুগ্রহ চাইলে একটু অনুকম্পা জাগে বৈকি। তা ছাড়া নিজেও ব্যবসা করে খান। পরতা আগের চেয়ে বেশী না হলে খরচা পুষিয়ে লাভ রাখা যায় না সে তিনি বোঝেন। তা ছাড়া দাম তো আগুন, কেনেও লোকে কম। সুতরাং আগে যেখানে পাঁচশো পয়সা পেলেই চলতো এখন সেখানে পাঁচশো আনার দরকার। তাও বা পাঁচশো খদ্দের কোথা, একশোয় এসে ঠেকেছে। ওই একশোর কাছ থেকেই পাঁচশো আনা তুলতে হয়। এসব তাঁর অজানা নয়। পাঁচশো আনা তুলতে হয়ই, হয় বেশী দামে বেচে, নয় তো ভেজাল মিশিয়ে ঠকিয়ে।

লোকটাকে বোকা-সোকাই মনে হচ্ছে। সত্যিই দামটা ষোল সতেরোই হবে। কিন্তু সস্তা দরে জিনিস কেনার মধ্যে একটা গর্ব আছে। আর যেখানে সতেরোতেই দেবে মনে হচ্ছে, সেখানে সাড়ে-সতেরো দিতে মন উঠে না।

শেষ পর্যন্ত সতেরো টাকা চার আনা দিয়েই বিবেককে বোঝ মানালেন তিনি। কেনাও হলো, মানও রইলো, দয়া দেখানোও হলো।

বিনোদও খুশী। চার আনা চার আনাই লাভ। সে তো কেনা দামেই দিতে তৈরী ছিল। একেবারে ফাঁকা গেলো না দিনটা। বিষ্টিটা ধরে গিয়েছে। আর কিছুক্ষণ থাকা চলে। কী জানি বউনি যখন হয়েছে, হঠাৎ দু একটা খদ্দের এসেও যেতে পারে।

পকেটে তুলে রাখতে গিয়ে কাঁচা টাকা একটা পড়ে গেল হাত থেকে। আওয়াজ শুনে চমকে উঠলো বিনোদ।

হ্যাঁ!

হাতে তুলে নিয়ে আবার বাজালো বিনোদ। তারপর সিমেণ্টের ওপর বার পাঁচেক ঠুকে ঠুকে দেখলো অচল টাকাটা ঠাট্টা করছে, খট্ খটাস্, খুট, খাট।

ঘাম এসে গেলো বিনোদের। শেষ পর্যন্ত ঠকিয়ে গেলো লোকটা! আমারই ঘাড়ে চালালো অচলটা! জোচ্চোর, হারামজাদা, লাভ দিয়েছে শালা আমাকে। বারো আনা পয়সা লোকসান, ডাহা লোকসান। দিলি দিলি না হয় সিকিটাই অচল দিতিস। তাতেই শালা খুঁজে খুঁজে খুচরো তিনটে টাকা বের করলো। কেন, নোট দিতে কি হয়েছিল? কী জানি তাই বা কে জানে, নোটগুলোও আবার অচল দিয়ে গেল কিনা।

নোটগুলো, খুচরো টাকা আর সিকিটা বার করে আলোর কাছে ধরে ধরে বাজিয়ে দেখে বিনোদ, কোনো শালাকে বিশ্বাস নেই আর।

চার আনা লাভের আনন্দে মশগুল হয়ে টাকাগুলো দেখে না নেওয়ার জন্য নিজেকেই এবার গাল দেয় বিনোদ, খা শালা, লাভ খা।

তবু অচল টাকাটা ফেলে দিতে পারলো না বিনোদ। যদি আট আনাও উশুল হয় বাসওয়ালাদের দিয়ে। দিনটাই অপয়া আজ। কার মুখ দেখে উঠেছিলো মনে নেই। হ্যাঁ, হয়েছে, সেই শালা কিপ্টেটা। হারামজাদাকে ধরে ঠেঙাবো এবার, ফের যদি কোনদিন ভোরবেলায় দেশলাই চাইতে আসে।

জিনিসপত্রগুলো বাঁধতে লাগলো বিনোদ দশটা নাগাদ। তবু টাকাটা হাতে এসেছে কাল ভাতটা জুটবে।

উনি আবার কে? এদিকেই যে আসছেন তাকিয়ে তাকিয়ে। আসুক, আজ আর আর বিক্রী করবে না সে। আর করেই যদি তো গলা কাটবে পেঁচিয়ে। শালা ভাল মানুষের দিন নেই। সবাই যদি ঠকাতে পারে সেই বা পারবে না কেন?

মেয়েটি এসে শুধোলো শাড়ী আছে?

গম্ভীর গলায় বিনোদ বললো, আর হবে না, বেঁধে ফেলেছি সব।
—আমার যে বড্ড দরকার ভাই, দাও না একখানা।
গিঁটটা শক্তভাবে বাঁধতে বাঁধতে বিনোদ বললো, তাঁতের শাড়ী আছে সব, পঁচিশ ত্রিশ টাকা দর।
—তাই দাও ভাই, বড্ড দরকার, একটু ভাল দেখে দিও।
নাঃ নেহাৎ নাছোড়বান্দা। আবার খুলে বসলো বিনোদ। দেখি যদি লোকশানটা উশুল হয়। উপরের দিক থেকে একখানা শাড়ী টেনে বের করে দিলো।
মেয়েটি দেখলো না ভাল করে, শুধু বললো, রঙটা উঠে যাবে না তো? কাউকে দেবে হয়তো জন্মদিনের উপহার। পেটে ভাত জোটে না লোকের, বিয়ে-পৈতেয় খাওয়াতে পারে না, তবু এই এক ঢঙ উঠেছে। আর বড়লোকের কাণ্ডই আলাদা। নিশ্চয়ই জন্মদিন, নয়তো এতো রাত্তিরে কেউ শাড়ী কিনতে আসে পঁচিশ টাকা দিয়ে? ভাদ্রমাসে যে বিয়ের দিন নেই সে আর কে না জানে।
ত্রিশ টাকা বললেও বোধহয় নিতো মেয়েটি তবু পঁচিশ টাকাই বলে ফেললো বিনোদ।
তিনখানা দশ টাকার নোট দিয়েছে। দেবে নাকি চালিয়ে অচল টাকাটা? নাঃ কেমন যেন, ভয় ঠিক নয়, কেমন একটা অস্বস্তি। পাঁচটাকার নোট একখানা ফেরৎ দিলো বিনোদ।
মেয়েটি বাসের জন্যে গিয়ে দাঁড়িয়েছে।
রাস্তায় লোকজন খুব কম। জিনিসগুলো আবার বাঁধতে বাঁধতে বিনোদ তাকিয়ে দেখছিলো। হঠাৎ ডেকে বসলো, শুনছেন, ও দিদি ঠাকরুণ—
আলোর দিকে ফিরে তাকালো মেয়েটি।
—আমাকে বলছো?
—আজ্ঞে, হ্যাঁ, শাড়ীখানা কি আপনার নিজের জন্যে নিলেন?
—কেন বলতো? মেয়েটি বিস্মিতভাবে বলে।

—আপনার নিজের জন্যে হলে এই শাড়ীখানা নিয়ে যান—

ক্রুদ্ধা মেয়েটি এগিয়ে এলো এবার। বললো,—বটে, রাত্তির বেলা একলা পেয়ে ইয়ার্কি মারতে এসেছো?

বিনোদ অপ্রস্তুত হয়ে জোর হাত করে বললো,—ছি ছি কি যে বলেন দিদি ঠাকরুণ। মায়ের তুল্য আপনি—বলছিলাম কি, ও শাড়ীটা ভাল নয় কিনা।

ন, তবে দিলে কেন? আরো রেগে উঠলো মেয়েটি।

—আজ্ঞে তা নয়—মানে, ওর দামটা পনের টাকা, আপনাকে ইয়ে ঠকিয়েছি কিনা, ভেবেছিলাম কাউকে উপহার-টুপহার দেবেন—

মেয়েটি অবাক হয়ে যায়। ঠকিয়ে আবার ফেরৎ দিতে চায়, এতো বেশ লোক। —বলে, কি করে বুঝলে উপহার-টুপহার নয়?

—আজ্ঞে আলোয় দেখলাম কিনা, আপনাম শাড়ীটা ছেঁড়া,—সেলাই। আগে ঠিক বুঝতে পারিনি।

অপ্রস্তুতের মত বোকাবোকাভাবে হাত কচলায় বিনোদ।